দাদা সমগ্র

তারাপদ রায়

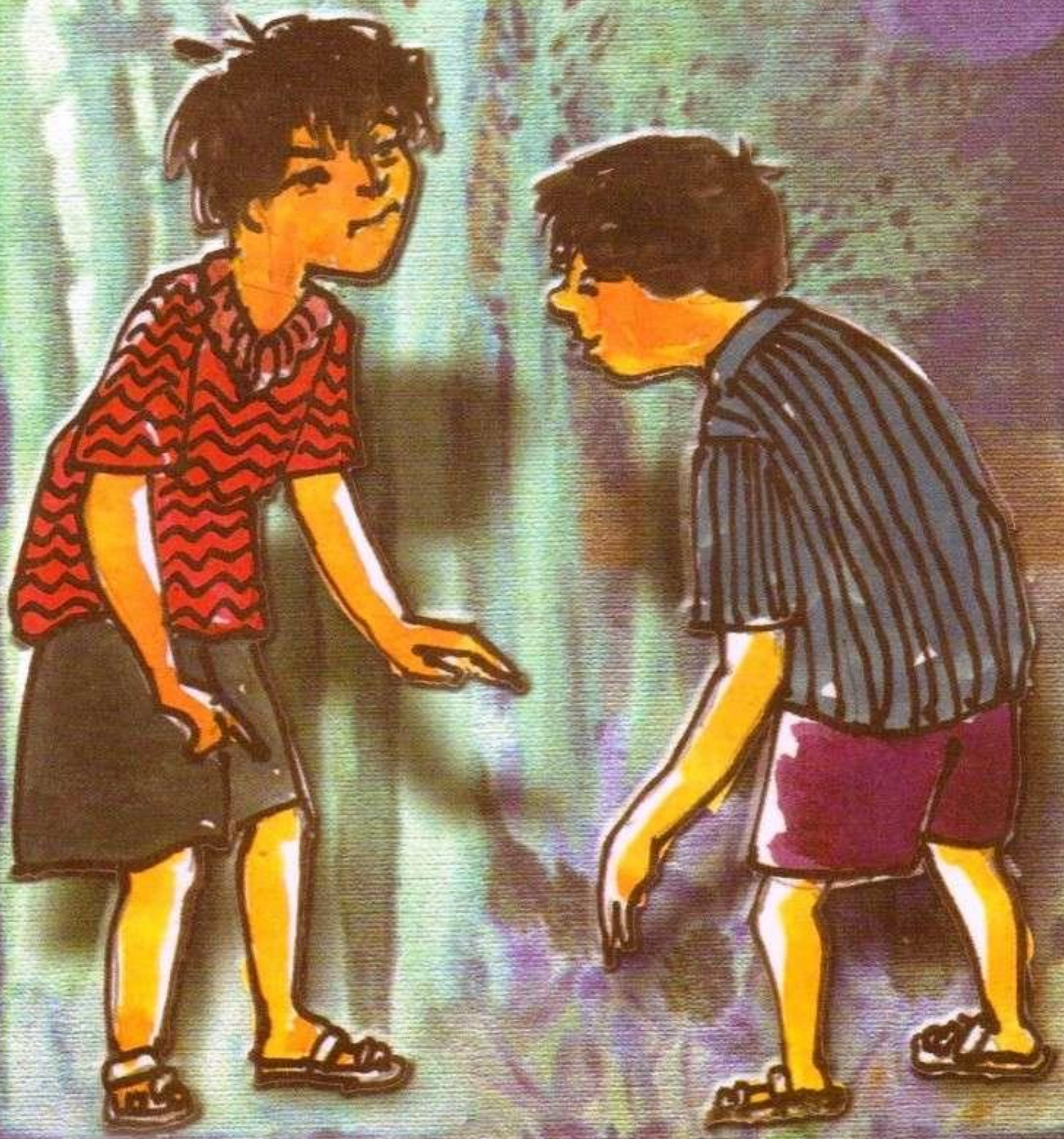

দাদা সমগ্র

তারাপদ রায়

pathagar.net

দে'জ পাবলিশিং।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ভূমিকা

আমার দাদার মতো মজার মানুষ সংসারে কম। আমার অসংখ্য গল্পে আমার দাদার চরিত্র ছড়িয়ে আছে। তারই কিছু গল্প একত্রিত করে এই বই। এর কোনোটি হয়তো ত্রিশ বছর আগে লেখা, আবার দুটি গল্প গত বছর পুজোয় লেখা, এ বছরেই বই হয়ে বেরিয়েছে। আবার অনেক গল্পেই দাদা হয়তো মুখ্য চরিত্র নয়।

তবুও সব মিলিয়ে আমার অকালমৃত অগ্রজের ছায়ারেখা যদি পাঠকের মনে ফুটে ওঠে তবে আমি ধন্য বোধ করব।

এইচ-এ ৫৫ সল্টলেক
সেক্টর ৩
কলকাতা- ৯৭

ইতি,
তারাপদ রায়
১ জানুয়ারি, ২০০৪

pathagar.net

সূচিপত্র

হারিয়ে যাওয়া	১৩	গর্জন মামা	৩১
চাবি হারানো	১৪	সাইকেল	৩২
নাম	১৫	ম্যালেরিয়া	৩৩
পরোপকার	১৬	হাতের লেখা	৩৪
চেতাবনি	১৭	জলে কুমির	৩৫
সবজান্তা-মামা	১৮	কচুপোড়া	৩৬
মাছ ধরা	১৯	টাইপ-রাইটার	৩৭
সাক্ষী	২০	জানালা	৪৭
সোনাঠাকুমা	২১	যুদ্ধের গল্প	৪৯
দাদার ধাঁধা	২২	বভ্রুবাহন কয়েকটি গাধার গল্প	৫৩
ঘুম	২৩	বিবি এগারো বারো	৬০
দাশগুপ্ত-স্যার	২৪	নস্যি	৬৭
খেয়া	২৫	জীবনবাবুর পায়রা	৭৭
ফুটবল	২৬	জ্যাকব	৮২
জবাগাছ	২৭	সাইকেলের সিট	৯১
হরিলুট	২৮	গর্জন তেল	৯৯
কলের গান	২৯	লিটি-কিটি	১০২
ভূগোলের ভুল	৩০	আমাদের ছোট নদী	১১০

pathagar.net

দাদা সমগ্র

pathagar.net

হারিয়ে যাওয়া

আমাদের ছোট শহরের এক প্রান্তে ছিল বিশাল এক জমিদারের প্রাসাদ। আমরা বলতাম, রাজবাড়ি। রথের সময়, সপ্তাহ ধরে বিরাট মেলা জমত সেই রাজবাড়ির উঠোনে। চারপাশের গ্রাম থেকে নদী-নালা বেয়ে কয়েকশো নৌকোয় করে দোকানিরা এসে ভিড় জমাত সেই মেলায়। আসল রথের দিন লোকসমাগম হত খুব। চারদিকে জল বলে আমরা মেলার মাঠে নৌকোয় করে যেতাম। ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে নৌকোয় করে রথের মেলায় বাড়িসুদ্ধ সকলে মিলে যাওয়া ছিল বছরের সবচেয়ে বড় মজা।

মেলার ভিড়ে অল্প বয়সী ছেলে-মেয়েরা খুব হারাত, আবার তাদের খুঁজেও পাওয়া যেত জাদুকরের তাঁবুর পিছনের ভিড়ে কিংবা জিলিপির দোকানের পাশে। বেশিক্ষণ কাউকে খুঁজে না পেলে, বাড়ির লোকেরা যখন তল্লাশ শুরু করত তখন পুরো মেলাতেই একটা সাড়া পড়ে যেত, অমুক গ্রামের বা তমুক বাড়ির বাচ্চা হারিয়েছে। কখনও-কখনও ছেলেধরার গুজবও রটত।

এই রকম এক বছর মেলায় পৌঁছে আমি আর দাদা বাড়ির লোকদের থেকে আলাদা হয়ে মেলা ঘুরে দেখতে দেখতে শোরগোল শুনলাম, কাদের দুটো ছেলে হারিয়ে গেছে। সে-বছর ভরা বর্ষা, মেলার চারপাশের খালগুলোতে যেমন স্রোত, তেমন জল। ছেলে দুটো জলে ডুবে বা ভেসেও যেতে পারে এই আশঙ্কায় একদল লোক মেলার চারপাশে খাল পাড় ধরে ধরে খুঁজতে লাগল তাদের।

আমি আর দাদাও, কৌতূহলবশত, সেই অনুসন্ধানরত দলের সঙ্গে যোগ দিলাম, যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলাম হারিয়ে যাওয়া ছেলে দুটোকে খুঁজে পাওয়ার। খালের পাশে পিছল কাদা, হাঁটা কঠিন, এদিকে ঝোপঝাড় বর্ষা পড়ে বেড়ে উঠেছে, দুটো চার আনা দামের রঙিন লাঠি কিনে আমরা দু'ভাই অন্য সকলের সঙ্গে সেই ঝোপঝাড় পিটিয়ে হারিয়ে যাওয়াদের খুঁজতে লাগলাম। আমরা যখন বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে দেখি আমাদের মুহুরিবাবু। তিনি বললেন, "তোমাদের জন্যে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। এত লোক তোমাদের খুঁজছে। এতক্ষণ তোমরা কোথায় ছিলে?"

আমি আর দাদা এবার একটু চোখ চাওয়াচাওয়ি করে বুঝে গেলাম, আসলে আমরাই সেই দু'জন যাদের সবাই খুঁজছে এবং সকলের সঙ্গে আমরা নিজেদেরই খুঁজছিলাম।

চাবি হারানো

চাবি হারানো ছিল এক গুরুতর ব্যাপার। দশ-পনেরো দিন বাদে-বাদেই প্রায় নিয়মিত ঘটত ব্যাপারটা। চাবি হারিয়ে যেত, মা কিংবা ঠাকুমা চাবি হারিয়ে ফেলতেন। আজকালও লোকে চাবি হারায়। কিন্তু চাবি হারানো আর সেই সঙ্গে চাবি খোঁজার মধ্যে এখন আর তত ঘটা নেই। কারণ সবাই বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়। এখন আর কেউ হলফ করে বলতে পারে না যে, বাড়ির মধ্যেই সে চাবি হারিয়েছে। রাস্তায়, অফিসে, ট্রামে-বাসে কত জায়গায় পড়ে গিয়ে থাকতে পারে সেই চাবি। তাই বাসায় খোঁজা আর তেমন জোরদার হয় না। কিন্তু তখন চাবি হারালে বাড়ির মধ্যেই হারিয়েছে। গিন্নিদের শাড়ির আঁচলে ফশ্‌কা গিঁট দিয়ে বাঁধা থাকত চাবির তোড়া। তাঁরা কদাচিৎ বাড়ির বাইরে যেতেন। শুধু পুকুরঘাটে স্নান করতে যাওয়ার সময় বা জামাকাপড় বদলাবার সময় তাঁরা চাবি আঁচল থেকে খুলে অন্য কোথাও রাখতেন।

এই সময়েই ঘটত আসল গোলমাল। আমার মা এবং ঠাকুমা দু'জনেই ছিলেন চাবি সম্বন্ধে অতি সাবধানী। চাবি আঁচল থেকে খুলে খুব সাবধানে কোথাও রেখে দিতেন, বইয়ের তাকের পেছনে কিংবা বিছানার তোশকের নীচে, এই সব দুর্গম জায়গায়। এবং পরে অনেক সময়ে তাঁরা মনে করতে পারতেন না, ঠিক কোথায় চাবিটা রেখেছেন। প্রথমে আলগোছে কিছুটা খুঁজতেন, তারপরেও যদি না পেতেন তখন শুরু হত গোলমাল। চারপাশে খোঁজ-খোঁজ পড়ে যেত। আমরা ছোটরা সবাই মিলে লেগে যেতাম চাবি খুঁজে বের করার কাজে। বিছানা উলটিয়ে, খাট-চেয়ার-টেবিল সরিয়ে, আলমারির মাথায় উঠে, কুলুঙ্গি-তাক সমস্ত ঘেঁটে ওলটপালট করে আমরা চাবি খুঁজতাম। অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত চাবি খুঁজতে, সকাল থেকে দুপুর, নাওয়া-খাওয়া মাথায় উঠত, চাবি খোঁজা চলছে তো চলছেই। তারপরে হয়তো চাবি পাওয়া যেত অন্য জায়গায়, ইঁদারার পাড়ে বা রান্নাঘরের তাকে। চাবি খোঁজার একটা নেশা ছিল। তা ছাড়া আমার মা আবার পাওয়া পাঁচ আনার বাতাসার হরিলুট মানত করতেন চাবি ফেরত পাওয়ার জন্যে। ফলে সব সময় সত্যিই যে চাবি হারাত তা নয়। মা'কে একটু ভয় পেতাম, কিন্তু কখনও কখনও ঠাকুমা'র চাবি আমি আর দাদা নিজেরাই লুকিয়ে রেখে পরে অনেক খোঁজাখুঁজি করে উদ্ধার করেছি। কারণ ঠাকুমা'র চাবি খুঁজে দিলে শুধু হরিলুট নয়, নগদ বখশিসও পেতাম আমরা। ঝকঝকে তামার পয়সা কিংবা ডবল পয়সা, ঠাকুমা খুঁজে-পাওয়া চাবি দিয়ে তোরঙ্গ খুলে আমাদের বের করে দিতেন। সোনার টাকার মতো উজ্জ্বল ছিল সেই সব তামার পয়সা।

নাম

আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে পশ্চিম দিকে অল্প কিছুটা গেলে মোড়ের মাথায় ছিল আমাদের শহরের কালীবাড়ি। যদিও নাম কালীবাড়ি, সেখানে দোল, দুর্গোৎসব, সঙ্কীর্তন সব কিছুই হত। আমরা পরীক্ষার দিন সকালে কালীবাড়িতে প্রণাম করে আসতাম। অনেক সময়, পুজোপার্বণের দিনে মা কিংবা ঠাকুমা'র সঙ্গে দল বেঁধে সন্ধেবেলা কালীবাড়িতে আরতি দেখতে যেতাম।

এই কালীবাড়ির পাশের বাড়িতেই থাকত আমাদের দুই বন্ধু, মানিক আর রতন। মানিক ছিল আমার চেয়ে অল্প ছোট, আর রতন আমার ছোট ভাই বিজনের চেয়েও ছোট। এরা ছোট বলে দাদা এদের পাত্তা দিত না। আমি আর বিজন প্রায়ই ওদের বাড়িতে যেতাম, ওরাও আমাদের বাড়িতে আসত।

বড় ভাই মানিকের একটা খুব ভাল গুণ ছিল। কালীবাড়ির পাশের বাড়িতে থাকার জন্যেই হোক বা অন্য কারণেই হোক, সে খুব ভাল কাঁসি বাজাতে পারত। অনেক সময়েই দেখেছি পুজো-মন্দিরে আরতির সময় মানিক একপাশে দাঁড়িয়ে কাঁসি বাজাচ্ছে।

রতন ছিল সরল প্রকৃতির ভালমানুষ গোছের। অনেক সময়েই সে না বুঝে মজার মজার কথা বলে ফেলত।

সেবার মানিক-রতনের এক ভাই জন্মাল। খুব ভোরবেলা দু' ভাই ছুটতে ছুটতে আমাদের বাসায় এসে খবর দিল, "আমাদের এক ভাই হয়েছে।"

আমার মা-ঠাকুমা সব প্রশ্ন করতে লাগলেন, "কেমন দেখতে হয়েছে", "গায়ের রং কেমন হয়েছে", "মাথায় চুল আছে কি না?" ওই সব নানারকম জিজ্ঞাসা। মানিক আর রতন, যে যা পারে, যথাসাধ্য এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগল।

অবশেষে আমার দাদা জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের ভাইয়ের নাম কী?" আমার মা বললেন, "ওদের দু'জনের নাম যখন মানিক-রতন, ওদের ভাইয়ের নাম সোনা কিংবা হিরে হবে।" মানিক চুপ করে ছিল, কিন্তু রতন ঘাড় নেড়ে বলল, "ভাইয়ের নাম জানা যায়নি। বলা যাবে না।" শুনে দাদা বলল, "কেন?" তখন রতন জানাল, "ভাই এখনও কথা বলতে পারছে না। তাই ও বলতে পারছে না ওর কী নাম। আমরাও জানতে পারছি না।"

BanglaBook.org

পরোপকার

সে বছর পরোপকারের ভূত চেপেছিল আমাদের কাঁধে। আমাদের স্কুলে যে নতুন ব্রতচারীর মাস্টারমশাই এসেছিলেন তিনি আমাদের ব্যায়াম, ব্রতচারী, নৃত্যগীত ইত্যাদি ছাড়াও নানা আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি বলতেন, 'দৈনিক অন্তত একটা করে পরোপকার করবে।'

এই পরোপকারের ব্যাপারটা আর কারও না হোক আমার দাদার মাথার মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। রাস্তায় একটা কুকুর তার বাচ্চাদের দুধ দিচ্ছিল না, বাচ্চাগুলো তখন বেশ বড় হয়েছে, মায়ের চেহারা হাড়জিরজিরে শুকনো। বাচ্চাগুলো কাছে গেলেই খেঁকিয়ে উঠছে। দাদা সেই বাচ্চাগুলোকে জোর করে মায়ের দুধ খাওয়াতে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে মা খেঁকিয়ে তেড়ে গেল দাদাকে। বহু কষ্টে প্রাণপণ দৌড়ে দাদা আত্মরক্ষা করে। কিন্তু এতেও দাদার শিক্ষা হয় না।

আমাদের ব্রতচারী মাস্টারমশাই সবচেয়ে জোর দিতেন অবলা জীবজন্তু, অন্ধ আতুর অসহায়দের উপকারের দিকে। সপ্তাহে প্রত্যেক শনিবার ব্রতচারী ক্লাসে মাস্টারমশাই জানতে চাইতেন, সেই সপ্তাহে কে কী পরোপকারের কাজ করেছে। তখন দাদা একবার ফেল করে আমার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ছে। সেদিন ক্লাসে দাদা এল দেরি করে, মাথার চুল এলোমেলো, জামার আস্তিন গোটানো, হাফপ্যান্টের নীচে হাঁটুতে ধুলো লেগে রয়েছে। দাদার এ-অবস্থা দেখে আমিও অবাক হলাম, কারণ আমরা দু'জনে একসঙ্গে বাড়ি থেকে বার হয়েছি, দাদা এতক্ষণ কোথায় কী করে এল কে জানে। দাদার এ-অবস্থা দেখে সমস্ত ক্লাসে একটা গুঞ্জন উঠল। মাস্টারমশাই জানতে চাইলেন, "কী ব্যাপার, এ-অবস্থা কেন? এত দেরি কেন?" দাদা হাঁটু থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, "একটা জন্তুর উপকার করতে গিয়ে বিপদে পড়েছিলাম। সেই জন্যেই দেরি হল। আমার কোনও দোষ নেই, আপনার কথা শুনে আমার বিপদ হয়েছে।"

বিস্মিত মাস্টারমশাই জানতে চাইলেন, "কী বিপদ?" দাদা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল, "আর বিপদ! ইস্কুলে আসার পথে আদালতের পিছনের মাঠটায় দেখি অনেকগুলো গোরু চরছে। একটা গোরু মাঠ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তখন যে লোকটা গোরু চরাচ্ছিল সে তাকে ছুটে গিয়ে লাঠি দিয়ে মারে। আমিও সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে গিয়ে লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি, লাঠি কেড়ে নিতে যাই। তারপর পনেরো মিনিট ধরে মারামারি, ধস্তাধস্তি। অন্য যারা গোরু চরাচ্ছিল তারাও আমাকে মারতে আসে। কোনওরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে দৌড়ে পালিয়ে এলাম।"

চেতাবনি

আমাদের ছেলেবেলায় চেতাবনি নামে একটা ভয়াবহ ব্যাপার নিয়ে খুব হুলস্থূল পড়েছিল। চেতাবনি ব্যাপারটা যে সঠিক কী, তখন বুঝতে পারিনি। পরে শুনেছি এটা হল পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী। চেতাবনি অনুযায়ী নাকি পৃথিবীতে নতুন যুগ আসবে। সে যা হোক আমাদের ছোট শহরে মহা হইচই পড়ে গিয়েছিল চেতাবনি সংবাদটা নিয়ে। খবরটা প্রথম এনেছিলেন মুহুরিবাবু। কী একটা মামলার কাজে তিনি জামালপুর গিয়েছিলেন, সেখানে রেল স্টেশনে খুব গণ্যমান্য লোকদের মুখে তিনি শুনে এসেছিলেন এই দুঃসংবাদ। খবরটা সেদিনই কলকাতা থেকে লোকমুখে রেলগাড়িতে করে জামালপুরে এসে পৌঁছেছে।

চৈত্র মাসের কত তারিখে যেন অমাবস্যার দিন দুপুরে যখন সূর্যগ্রহণ হবে, তখন পৃথিবীটা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে। কোনও মানুষই আর বেঁচে থাকবে না। কলিযুগ বিনাশ হয়ে সত্যযুগ আবার ফিরে আসবে।

যেভাবেই হোক চেতাবনির কথাটা আমাদের বাড়ি থেকে পুরো শহরে ছড়িয়ে পড়ল একবেলার মধ্যে। তখন দেখা গেল আরও অনেকেই চেতাবনির ব্যাপারটা আগেই জানত, শুধু লোকে ভয় পাবে বলে বলাবলি করেনি।

শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরিব সবাই ভীত হয়ে পড়ল। রাস্তা-ঘাটে, বাজার-হাটে, এমনকী অফিস-আদালতে, ইস্কুলের ক্লাসে আলোচনা হতে লাগল কীভাবে ধ্বংসটা হবে, কবে, কখন ইত্যাদি। এর মধ্যে একটা আশার কথা শোনা গেল যে, হয়তো সবাই মারা পড়বে না, শুধু যারা মহাপাপী তারা এ-যাত্রা পরিত্রাণ পাবে না।

আমি আর দাদা তখন একই ক্লাসে পড়ছি। ক্লাসে মাস্টারমশাইকে সবাই মিলে ধরা হল, 'স্যার, চেতাবনির দিন কী হবে?' মাস্টারমশাই ছিলেন এক নম্বরের ভিতু, তিনি বললেন, "সর্বনাশ হবে। আকাশ অন্ধকার হয়ে যাবে। বাজ পড়বে মুহুর্মুহু, বিদ্যুৎ চমকাতে থাকবে, পৃথিবী ফেটে দোতলা বাড়ি সমান গরম জলের স্রোত উঠে সবকিছু ডুবিয়ে-ভাসিয়ে দেবে। একেবারে মহাপ্রলয় যাকে বলে।" শুনে আমরা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে গেলাম। শুধু দাদা নির্বিকার, সন্ত্রস্ত মাস্টারমশাইকে স্তম্ভিত করে দিয়ে দাদা উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "তা হলে স্যার ওই চেতাবনির দিন ইস্কুল ছুটি থাকবে কি?"

সবজান্তা-মামা

আমাদের ছোটকাকিমার এক ভাই ছিলেন। তিনি থাকতেন আমাদের শহর থেকে একটু দূরের একটা গ্রামে। মাঝে মধ্যে তিনি কোনও কাজে শহরে এলে আমাদের বাসায় উঠতেন। খুড়তুতো ভাইদের সুবাদে আমরাও তাঁকে মামা বলতাম।

ইনি লোক খুব ভাল ছিলেন, কিন্তু মামার একটা দোষ ছিল যে, তিনি ছিলেন সবজান্তা। সব বিষয়ে সবকিছু তিনি জানতেন। আর আমাদের সব সময় উলটো-পালটা প্রশ্ন করতেন। 'আকবর বাদশার ক' ভাই ছিল', 'ঢাকা থেকে কলকাতা কতদূর', 'জবাফুল দিনের কোন্ সময় ফোটে' ইত্যাদি যত রাজ্যের বিদ্‌ঘুটে প্রশ্ন করার অভ্যেস ছিল তাঁর। আমরা কোনও কোনও প্রশ্নের জবাব দিতে পারতাম, কোনওটা পারতাম না। জবাব দিলে মামা খুশি হয়ে কখনও কখনও আমাদের লজেন্স বা বিস্কুট কিনে দিতেন। যে-কোনও কারণেই হোক দাদা কিন্তু মোটেই এই সবজান্তা-মামাকে সহ্য করতে পারত না। যথাসাধ্য এড়িয়ে এড়িয়ে চলত। একদিন মামা বললেন, আমাদের সন্তোষের রাজবাড়ি দেখাতে নিয়ে যাবেন। এই রাজবাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে দু' মাইল, আড়াই মাইল দূরে, তখনও আমাদের ওদিকে রিকশা পৌঁছয়নি। কোথাও যেতে হলে পায়ে হেঁটে কিংবা সাইকেলে যেতে হত। আমরা সবাই মিলে মামার সঙ্গে হেঁটেই রওনা হলাম। রাজবাড়ি দেখার লোভ সামলাতে না পেরে দাদাও আমাদের সঙ্গ নিল।

পথে মামাবাবু আমাদের নানারকম পাখি, গাছপালা দেখিয়ে প্রশ্ন করে করে সেসব চিনিয়ে দিতে লাগলেন। একটা পাখি দেখিয়ে আমাদের শেখালেন, "এটা মাছরাঙা পাখি।" তারপর বড় রাস্তার একপাশে একটা গাছ দেখিয়ে বললেন, "এটা হল মেহগনি গাছ। এর পাতাগুলি ভালো করে দ্যাখো, কেমন অন্যরকমের দেখতে!" ফেরার পথে সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল, দূরে মাঠের মধ্যে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, "ওই দ্যাখো ধাড়ি খেঁকশেয়াল।"

আমরা ক্লান্ত হয়ে বাড়ি পৌঁছলে তিনি বললেন, "রাজবাড়ি দেখা ছাড়াও আজ তোমরা অনেক কিছু নতুন চিনতে পারলে, শিখলে।" আমরা সমস্বরে "হ্যাঁ" বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু দাদা হঠাৎ বলে বসল, "হ্যাঁ শিখলাম যে, কাঠঠোকরা পাখিকে বলে মাছরাঙা পাখি, ইউক্যালিপটাস গাছকে বলে মেহগনি মাছ, আর শেয়ালকে বলে ধাড়ি খেঁকশেয়াল।" দাদা এতগুলো ভুল ধরে ফেলায় সেদিন সবজান্তা-মামা খুবই বোকা বনে গিয়েছিলেন।

pathagar.net

মাছ ধরা

একবার খুব মাছ ধরার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল আমাদের ছোট শহরে। আমাদের শহরের দক্ষিণ সীমানায় ছিল একটা বড় বিল। কোনও নাম ছিল না বিলটার, তবে সবাই বলত পদ্মবিল। তার কারণ বোধহয় এই যে, পুজোর সময় দুর্গাঠাকুরের পদ্মফুল ওই বিল থেকে তুলে আনা হত।

প্রত্যেক বছর শীতকালে অনেক লোক ছিপ নিয়ে ওখানে মাছ ধরতে যেত। বড় বড় রুই-বোয়াল থেকে কই-মাগুর সবই ছিল ওই বিলে। কিন্তু সেবার বন্যা হয়ে যাওয়ার জন্যেই সম্ভবত শীত শুরু হওয়ার আগেই চারদিকে রটে গেল, এবার পদ্মবিলে মাছ খুব বেশি। দলে-দলে লোক ছিপ হাতে ছুটল পদ্মবিলের দিকে। কেউ নাবালক, কেউ যুবক, কেউ বুড়ো, কারও সামান্য হাতছিপ, কারও বা হুইল-বঁড়শি।

আমাদের ইস্কুলের অ্যানুয়াল পরীক্ষা তখনও শেষ হয়নি। কিন্তু চারদিকে মাছ ধরার ধুম দেখে আমরা অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। দাদা পরীক্ষার মধ্যেই এর-ওর কাছে থেকে পয়সা চেয়ে-চিন্তে সংগ্রহ করে বঁড়শি আর টোনসুতো কিনে ফেলল; সঙ্গে একটা রঙিন ময়ূরের পালক, সেটা কেটে বানানো হল ফাতনা। তারপর বাঁশঝাড় থেকে একটা কঞ্চি কেটে নিয়ে ছিপ তৈরি হয়ে গেল। এরপর শুধু পরীক্ষা-শেষের অপেক্ষা। পরীক্ষা যেদিন শেষ হল, সেদিন আমগাছ থেকে লাল পিঁপড়ের বাসা ভেঙে ডিম নিয়ে এল দাদা। সে-ডিম থেকে পিঁপড়ে ছাড়াতে গিয়ে আমার আর বিজনের হাত লাল হয়ে গেল পিঁপড়ের কামড়ে। পিঁপড়ের ডিমের সঙ্গে ময়দা মেখে প্রস্তুত হল মাছের খাবার। পরদিন ভোর হতে না হতে আমরা তিনভাই রওনা দিলাম পদ্মবিলের দিকে। পদ্মবিলে পৌঁছে দেখি, হইহই ব্যাপার। সব সম্ভবপর জায়গাতেই ছিপধারীরা এরই মধ্যে বসে পড়েছে। অনেক খুঁজে-পেতে একটা জামরুল গাছের গুঁড়ির ওপরে এক বুড়োর পাশে গিয়ে তিনভাই ছিপ ফেললাম। বুড়ো আমাদের দেখে বিরক্ত হয়ে হুঁশিয়ার করে দিলেন, "দ্যাখো খোকারা, কথা একদম বলবে না, মাছেরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে।"

ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায়। আমরা নিঃশব্দে ছিপ ধরে বসে আছি। কথা বলছি না, কিন্তু মাছেরা পালিয়েই রইল। এগারোটা নাগাদ বিজন বলল, "বাড়ি যাচ্ছি।" বলে চলে গেল। সাড়ে বারোটার সময় আমি বললাম, "মাছ আর নেই মনে হয়।" বুড়ো কটমট করে তাকালেন। দুটোর সময় নিঃশব্দে পাউরুটি চিবোতে চিবোতে দাদা বলল, "মাছ নেই।" এবার বুড়ো খেপে গিয়ে আমাদের তাড়িয়ে দিলেন। বললেন, "তোমরা ভাগো, এত কথা বললে মাছ ধরা যায় না।"

আমরা দু'ভাই ক্ষুণ্ণ মনে, ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরে এলাম।

সাক্ষী

কলকাতায় কুল বলতে টোপাকুল আর নারকেলি কুল—এই দু'রকমেরই ধরা হয়, আমাদের ওখানে কিন্তু সে-রকম ছিল না। ছেলেবেলায় আমাদের এলাকায় দিশি গোল আকারের টোপাকুলকে বলা হত বড়ুই, আর কুল বলা হত নারকেলি কুলকে। অবশ্য কেউ-কেউ নারকেলি কুলকে শুধু কুল না বলে কেন যেন কাশীর কুলও বলত, বোধহয় এ-ফলগুলো বা ফলগাছগুলো কাশী ইত্যাদি পুরনো অঞ্চল থেকে আসত বলে।

সে যা হোক আমাদের ওই পুরনো মফস্বলে টোপাকুল বা বড়ুইয়ের খুব ছড়াছড়ি ছিল, পৌষ মাসের মাঝামাঝি থেকে প্রায় ফাল্গুনের প্রথম পর্যন্ত পুরো শীতকালটাই ছিল টোপাকুলের তাম্র-মধুর স্বাদে ভরা। নারকেলি কুল বিশেষ পাওয়া যেত না। সরস্বতী পুজোর আগে বাইরের চালান এলে বাজারে দু-একদিন উঠত। সরস্বতী পুজোয় দুধের দোয়াতে মুখ চাপা দেওয়ার জন্যে নারকেলি কুল লাগত। দাম সে-সময়কার তুলনায়ও বেশ বেশি ছিল।

দুর্লভ ছিল বলেই বোধহয় আমরা খুব নারকেলি কুল খেতে ভালবাসতাম। দাদার তো বিশেষ লোভ ছিল এই ফলটির প্রতি। আমাদের ছোট শহরে প্রায় প্রতি বাড়িতেই অনেক ফলগাছ ছিল, কিন্তু শুধু রায়চৌধুরীদের বাড়ি ছাড়া আর কোনও বাড়িতে নারকেলি কুলের গাছ ছিল না। একবার কী দুর্মতি যে হল আমাদের, আরও দু-চারজনের সঙ্গে দল পাকিয়ে রায়চৌধুরীদের বাড়িতে একদিন ভোরবেলায় কুল চুরি করতে গেলাম এবং ধরা পড়তে-পড়তে বেঁচে গেলাম। বুড়ো রায়চৌধুরী ওই সময় কুলগাছের পেছনের তরকারির বাগানে মালিকে দিয়ে নিঃশব্দে কাজ করাচ্ছিলেন। আমরা কিছু টের পাইনি। দাদা গাছে উঠে কুলের ডালে ঝাঁকি দিতেই চিৎকার উঠল, "কে? কে কুল পাড়ছে?" আমরা দৌড়ে পালালাম, দাদাও পালাল, কিন্তু দাদাকে চিনে ফেললেন রায়চৌধুরীমশাই এবং আমাদের বাসায় নালিশ জানালেন।

দাদা কিন্তু সরাসরি অস্বীকার করল এই অভিযোগ। বলল, "আমি কোনওদিন আপনার কুলগাছে উঠিনি, আপনার যে কুলগাছ আছে তাই জানি না।"

রায়চৌধুরীমশাই বিলক্ষণ খেপে গেলেন, বললেন, "রীতিমতো সাক্ষী আছে, আমার দুই মালি দেখেছে, আমি দেখেছি।"

দাদা জিজ্ঞেস করল, "এই আপনার প্রমাণ?"

রায়চৌধুরী বললেন, "তিনজন সাক্ষী কম নাকি?"

দাদা বলল, "আমি এখনই ছ'জন সাক্ষী নিয়ে আসতে পারি যারা আমাকে গাছে উঠতে দ্যাখেনি।" দাদার এই আজব জবাবে সবাই বোকা বনে গেল। কিন্তু দাদা শেষ পর্যন্ত ছাড় পায়নি। বাড়িতে সাজা পেতে হয়েছিল।

সোনাঠাকুমা

বাবার এক কাকিমা ছিলেন। বাবা-কাকারা তাঁকে ডাকতেন সোনামা বলে। আমরা বলতাম সোনাঠাকুমা। সোনাঠাকুমা ছিলেন বিধবা। বছরের অধিকাংশ সময় থাকতেন আমাদের গ্রামের বাড়িতে, সেটা ছিল শহরের বাড়ি থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে। বর্ষার সময় আমাদের গ্রামের উঠোনে প্রায় প্রত্যেক বছরই জল উঠত, কোনও-কোনওবার হাঁটু-জল, কোমর-জল পর্যন্ত হত। কোমর জল মানে বড়দের কোমর পর্যন্ত ডোবা জল, অর্থাৎ সেটা ছিল আমাদের ছোটদের পক্ষে গলা-ডোবা, এমনকী কোনও-কোনও ক্ষেত্রে একেবারে ডুব-জল।

আমরা বর্ষাকালে কখনওই গ্রামের বাড়িতে যেতাম না। বরং অনেক বছরই বিশেষ করে যেসব বছর খুব বেশি জল হত, সোনাঠাকুমা নিজেই শহরের বাড়িতে উঠে আসতেন। তারপরে গ্রামের বাড়ির উঠোন থেকে জল নেমে যাওয়ার খবর এলে তখন আবার ফিরে যেতেন।

সোনাঠাকুমা আমাদের শহরের বাসায় যখন আসতেন, আমাদের ভাইয়েদের মধ্যে আনন্দের হিল্লোল পড়ে যেত। সারা গ্রীষ্ম জুড়ে গ্রামের বাড়ির গাছের পাকা আম নিংড়ে, বড়-বড় আমসত্ত্ব বানাতেন সোনাঠাকুমা। তারপর বর্ষায় আসার সময় সেসব শুকনো আমসত্ত্ব মাটির হাঁড়িতে করে নিয়ে আসতেন। শুধু আমসত্ত্ব নিয়ে আসাই নয়, যত রকম নাড়ু-মোয়া সম্ভব, নিজের হাতে বানিয়ে ছোট-বড় টিনের কৌটোয় করে নিয়ে আসতেন।

কিন্তু শুধু সুখাদ্যের লোভেই সোনাঠাকুমা এলে আমরা আনন্দে নেচে উঠতাম তা নয়। আসল কারণ ছিল আরও গুরুতর। যতদিন তিনি বাসায় আছেন, আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ, আমাদের গালাগাল করার কিংবা গায়ে হাত তোলার ক্ষমতা নেই মা, বাবা কিংবা কাকাদের। সোনাঠাকুমা র সাদা আঁচলের আড়ালে আমরা অকুতোভয়ে এবং পরমানন্দে দিন কাটাতাম।

সেবার দাদা হাফইয়ারলিতে প্রায় সব বিষয়ে ফেল করল। গরমের ছুটির পর বর্ষার গোড়ায় ফল বেরোল। ভাগ্য ভাল, তার আগের দিনই সোনাঠাকুমা এসেছেন। রেজাল্ট দেখে ছোটকাকা দাদাকে বললেন, "দাঁড়া, সোনামা আগে গ্রামে যাক, তারপর তোর মজা দেখাচ্ছি।" এদিকে সোনাঠাকুমা'র ফিরে যাওয়ার দিন যত ঘনিয়ে এল দাদা তত সোনাঠাকুমাকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল, "না তুমি এখন যাবে না, কিছুতেই যাবে না।" এই ব্যাকুলতা দেখে বুদ্ধিমতী সোনাঠাকুমা আসল কারণটা সহজেই জানতে পারলেন এবং ছোটকাকাকে শাসিয়ে দিলেন, "ওদের গায়ে হাত দেবে না, সাবধান। তুমি নিজে ওদের থেকে লেখাপড়ায় ভাল ছিলে না।"

এতে কাজ হয়েছিল, ফল খারাপ করেও দাদা সেবার মার খায়নি।

pathagar.net

দাদার ধাঁধা

শীতের গোড়ায় স্কুলের অ্যানুয়াল পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে এদিক-ওদিক থেকে মাসতুতো, পিসতুতো, মামাতো ভাইয়েরা আমাদের কাছে বেড়াতে আসত। এদের মধ্যে চঞ্চল ছিল আমার চেয়ে এক বছরের বড়, আর দাদার থেকে এক বছরের ছোট। সে কলকাতার ছেলে, তার চালচলন ছিল একেবারে আলাদা, মফস্বল ইস্কুলের ছাত্র বলে সে আমাদের মানুষের মধ্যে গণ্য করত না। আমরাও তাকে বেশ সমীহ করতাম। একবার সে এল ধাঁধার ঝোলা ঘাড়ে করে। যখন-তখন উলটোপালটা প্রশ্ন, সে-সব প্রশ্নের কত প্যাঁচ, 'কোন্ জিনিস যখন সাদা তখন নোংরা, আর যখন একদম কালো তখন ফর্সা?' আমরা কী করে জানব যে, এ-প্রশ্নের সোজা উত্তর হল, 'ব্ল্যাকবোর্ড'। উত্তর পারিনি বলে সে মিটমিট করে হাসত। তারপরে অপমানজনকভাবে বলত, "কেন, ব্ল্যাকবোর্ড দেখিসনি? তোদের বিন্দুবাসিনী বয়েজ হাই ইংলিশ স্কুলে বুঝি ব্ল্যাকবোর্ড নেই?"

আরেকদিন চঞ্চল একটা হেঁয়ালি করল, দাদাকে জিজ্ঞেস করল, "বল তো, কোন্ জিনিস স্থির হয়ে থাকে, কিন্তু সব সময় চলে?" দাদা কেন, আমাদের মধ্যে কেউই ভেবে উঠতে পারলাম না যে, জিনিসটা হল ঘড়ি।

বারবার জব্দ হতে হতে শেষে দাদা একদিন খেপে গেল। চঞ্চলকে বলল, "দ্যাখ, তোর সঙ্গে একটা ধাঁধার প্রতিযোগিতা করব।"

চঞ্চল বলল, "কীরকম?"

দাদা বলল, "তুই তো আমার থেকে সবই বেশি জানিস, তাই আমি যে প্রশ্ন করব তার উত্তর যদি তুই দিতে না পারিস, তুই আমাকে আট আনা পয়সা দিবি। আর তোর প্রশ্নের উত্তর আমি যদি দিতে না পারি, আমি তো পারবই না, আমি তখন দেব এক আনা।" দাদা যে একবারও জিততে পারে, এ-কথা কল্পনা করতে না পেরে চতুর চঞ্চল রাজি হয়ে গেল এই প্রস্তাবে। সে ধরে নিল প্রত্যেকবারই তার জিত হবে, দাদার হার হবে, সুতরাং এক বা আট আনায় কিছু যায় আসে না।

দাদাই প্রথম প্রশ্ন করল, খুবই বিদঘুটে প্রশ্ন, "কোন্ জিনিসের দুটো মাথা, চারটে লেজ, রাতে জাগে, দিনে ঘুমোয়, পেটের কাছে হলদে রঙের ছোপ আছে, খিদে পেলে গান গায়?"

অনেক ভেবেচিন্তে চঞ্চল পরাজয় স্বীকার করল, বলল, "জানি না।"

দাদা সঙ্গে-সঙ্গে ধরল, "দে, আট আনা।"

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আট আনা পয়সা দিয়ে চঞ্চল বলল, "এবার তুই বল্ জিনিসটা কী?"

দাদা অম্লানবদনে বলল, "আমিও জানি না।"

তারপর এক আনা পয়সা চঞ্চলকে দিয়ে বলল, "এই নে, আমিও হারলাম।"

ঘুম

আমার দাদার চিরকালই ঘুম বড় বেশি। সুযোগ পেলেই ঘুমোয়। ময়দানে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচ হচ্ছে, সারা মাঠ, দর্শকের গ্যালারি উত্তেজিত, টানটান। দাদা কিন্তু তারই মধ্যে আমার পাশে বসে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ হইহই-রইরই চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে চোখ কচলিয়ে জেগে উঠে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "গোল?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ।" কোন্ পক্ষ গোল দিয়েছে কোন্ পক্ষ গোল খেয়েছে কিছুই খোঁজ না নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। বলা বাহুল্য দাদা ছেলেবেলায় এই রকমই ছিল, কিংবা বলা উচিত, ঘুমের ব্যাপারে এর থেকেও বেশি ছিল।

ইস্কুলের কথা মনে পড়ছে। দাদা সব ক্লাসে ঘুমোয়, অঙ্ক, ইংরেজি, বাংলা, এমনকী ভূগোল-ইতিহাস, ঘুমের ব্যাপারে তার কোনও ভেদাভেদ নেই। কত ক্লাস শেষ হয়ে তারপর পরের ক্লাস শুরু হয়, কোনও খেয়াল নেই, ঘুমোচ্ছে তো ঘুমোচ্ছেই।

স্কুলের মাস্টারমশাইরা হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা যে তাঁদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেননি তা নয়। ক্লাসে ঘুমনোর অপরাধে তাঁরা গালমন্দ করেছেন। দাদা মাথা নিচু করে নির্বিকারভাবে সেইসব গালমন্দ শুনেছে। তাকে বেঞ্চির উপরে দাঁড় করানো হয়েছে, পরের মুহূর্তে দাদা সেই বেঞ্চির উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমোতে আরম্ভ করেছে। নিলডাউন করানো হয়েছে, সেই নিলডাউন অবস্থাতেও প্রাণ ভরে ঘুমিয়েছে।

ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে ইস্কুলের জীবনটা ভালোই কাটিয়ে দিচ্ছিল, এমন সময় ইস্কুলে এক নতুন মাস্টারমশাই এলেন। নতুন মাস্টারমশায়ের নামটা মনে পড়ছে না, কিন্তু মনে আছে যে, আমরা তাঁকে বহুদিন পর্যন্ত 'নতুন স্যার' বলেছি। জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর হলেও, নতুন স্যার দেখতে ছিলেন রোগা বেঁটে চকখড়ির মতো ফর্সা। কিন্তু তাঁর মেজাজ ছিল ভয়াবহ তিরিক্ষি। তিনি এসেই দাদার ঘুমের ভীষণ বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি স্পষ্ট বললেন, "আমার ক্লাসে তুমি কিছুতেই ঘুমোতে পারবে না।" অম্লানবদনে দাদা বলল, "পারব।" বাজখাঁই গলায় নতুন স্যার ধমকে উঠলেন, "মানে!" সরলভাবে দাদা বলল, "স্যার, আপনার গলাটা বড় গমগমে। আপনি যদি ক্লাসে একটু কম চেঁচান তা হলেই আমি একটু চেষ্টা করলেই ঘুমোতে পারব।"

দাশগুপ্ত-স্যার

সব ইস্কুলেই খারাপ-ভাল, নরম-রাগী, নানা-রকম মাস্টারমশাই থাকেন। আমাদের ইস্কুলেও তাই ছিল। তবে একবার আমাদের ইস্কুলে দাশগুপ্ত-স্যার বলে এক মাস্টারমশাই এসেছিলেন। তাঁর মতো খাবাপ মাস্টারমশাই আমরা আর জীবনে দেখিনি। দাশগুপ্ত-স্যার কিছুদিন পরে আমাদের স্কুল ছেড়ে আমাদের শহরেরই আর একপাশে খালের ওপারে অন্য একটা ইস্কুলে গিয়েছিলেন। সেখানকার বেশ কয়েকটি ছেলেকে চিনতাম, তারাও একবাক্যে স্বীকার করেছে যে, কোনও শিক্ষকের আচরণ যে এমন হতে পারে সেটা কল্পনা করাও কঠিন। দাশগুপ্ত-স্যার ছিলেন যেমন মোটা, তেমন লোভী। তাঁর কাজই ছিল ক্লাসে ঢুকে প্রথমেই একের পর এক প্রত্যেককে সার্চ করে পকেট থেকে সব খুচরো পয়সা কেড়ে নেওয়া। তাঁর বক্তব্য ছিল, ছোটদের হাতে পয়সা থাকলে বখে যায়। তিনি তাই তাদের পয়সা কেড়ে বিকেলে ছুটির পর ইস্কুলের উলটো দিকের তেওয়ারির মিষ্টির দোকানের রসগোল্লা আর চমচম কিনে খেতেন। আমরা মোজার মধ্যে, বইয়ের মলাটের ভাঁজে, এমনকী ক্লাসঘরের জানলার আড়ালে পয়সা লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করতাম, কিন্তু কী শ্যেনদৃষ্টি ছিল তাঁর, প্রত্যেকবারই ধরা পড়তাম। মোট কথা, দাশগুপ্ত-স্যার আমাদের জীবন অতিষ্ঠ করে দিয়েছিলেন। একদিন দাশগুপ্ত-স্যার কী কারণে যেন ইস্কুলে আসেননি। ক্লাসে হইচই হচ্ছে দেখে হেডস্যার ক্লাস নিতে এলেন। সেটা ছিল অঙ্কের ক্লাস, আমাদের শান্ত রাখতে হেডস্যার মুখে-মুখে ছোট-ছোট অঙ্ক দিচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন ভালমানুষ। কথায়-কথায় জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, তোমাদের দাশগুপ্ত-স্যারকে যদি বিদ্যালয় থেকে সাতশো টাকা আগাম দেওয়া হয় আর তিনি যদি মাসে-মাসে পঞ্চাশ টাকা করে শোধ দেন, তাহলে আট মাস পরে তাঁর কাছে কত পাওনা থাকবে?"

লাস্ট বেঞ্চে বসে ছিল দাদা, হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "সাতশো টাকাই পাওনা থাকবে।"

হেডস্যার অবাক হয়ে বললেন, "সে কী!"

দাদা বলল, "হ্যাঁ স্যার, তাই ঠিক। আপনি দাশগুপ্ত-স্যারকে চেনেন না, তাই জানেন না।"

pathagar.net

খেয়া

সামান্য আখের গুড় আর আটার ভুসি মিশিয়ে প্রস্তুত হত একটি স্বর্গীয় খাদ্য, তক্তা-বিস্কুট। ইঞ্চি দুয়েক পাশে আর ছ'ইঞ্চি লম্বা; চৌকো আকারের পাতলা কাঠের তক্তার মতো দেখতে সেই বিস্কুট, লালচে রং এবং মুচমুচে মিষ্টি স্বাদ।

এক-একটার দাম ছিল এক পয়সা। সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের নাম ও চিত্রাঙ্কিত সেই সব তামার পয়সা। বড়-বড় গোল আকারের, পরবর্তী সময়ের ফুটো পয়সা বা নয়া পয়সার মতো সংক্ষিপ্ত নয়। নতুন চকচকে তামার পয়সা সোনার টাকার মতো ঝলমল করত। তখন বাড়িতে আত্মীয়স্বজন এলে চলে যাওয়ার সময় কাজের লোকদেব সঙ্গে বাড়ির বাচ্চাকাচ্চাদেরও নগদ পয়সা বখশিশ দিয়ে যেতেন। কারও যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এলেই আমরা সতর্ক হয়ে যেতাম, বাড়ির মধ্যে কাছাকাছি থাকতাম, যেন চোখের আড়াল হলেই দুর্লভ বখশিশ থেকে বঞ্চিত হব। মোটামুটি বখশিশের পরিমাণ ছিল মাথা প্রতি দুটো কি চারটে তামার পয়সা এবং সেই পযসাগুলির অনতিবিলম্বে গতি হত উমেশদের দোকানে, তক্তা-বিস্কুটের জন্যে। একবার একজন উদার প্রকৃতির অতিথি এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে, বোধহয় বাবার বড়মামা। আমরা ডাকতাম বড়দাদু। তিনি যাওয়ার সময় আমাদের তিন ভাইকে এবং অন্য বাচ্চাদেরও প্রত্যেককে দুটো করে ঝকমকে পিতলের এক আনি অর্থাৎ পুরনো আট পয়সা দিয়ে গেলেন।

এত পয়সা পেয়ে আমাদের মাথা ঘুরে গেল। দাদা বলল, "উমেশদা খুব ঠকায়। আমরা সব পয়সা একত্র করে বাজারের পিছনে নদীর ধারে যে বিস্কুটের কারখানা আছে, সেখানে থেকে একসঙ্গে এক সের তক্তা-বিস্কুট কিনে আনব। তাতে খুব লাভ হবে।"

আমরা সেদিন বিকেলেই দাদার সঙ্গে বিস্কুটের কারখানায় গেলাম। তারা বলল, "এখন বিস্কুট বানানো নেই, দু-তিনদিন পরে এসো।" আমরা খুবই নিরাশ হয়ে কারখানা থেকে বেরিয়ে নদীর ধারে এসে দাঁড়ালাম। কাছেই নদীর ঘাট, খেয়া পারাপার হচ্ছে হঠাৎ আমার মাথায় বুদ্ধি এল, বিস্কুট যখন কেনা হল না, আমাদের কাছে যখন পয়সা আছে সেই পয়সা দিয়ে যদি নদী পার হতে পারি, সে খুব মজার ব্যাপার হবে। ঘাটে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম পার হতে দু' পয়সা করে লাগে। সেই আমাদের জীবনে প্রথম নদীতে খেয়া পারাপার। দু'বার পার হলাম, দু'বার ফিরে এলাম। সেদিন বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গিয়েছিল। আমরা খুব বকুনি খেলাম। কিন্তু সেই নৌকো চড়ার আনন্দ আজও মনে আছে।

pathagar.net

ফুটবল

প্রত্যেক বছর গরমের ছুটির সময় আমরা ভাইয়েরা মামার বাড়ি যেতাম। সেখানে অঢেল ছিল আম-কাঁঠালের গাছ। ফলও হত প্রচুর। আম-কাঁঠাল শুধু নয়, ছিল জামরুল, দিশি খেজুর, আর সুগন্ধ গোলাপজাম। সবচেয়ে প্রথমে পাকত লিচু, সেই সময়ে আমরা মামার বাড়ি গিয়ে পৌঁছতাম, আর ফিরতাম বর্ষার শুরুতে, কালোজামের মরসুম যখন পুরোদমে চলছে। এই ফলের সময়টা আবার ছিল ফুটবলের সময়। আমরা মামার বাড়ির মাঠে কাঁচা বাতাবিলেবু দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফুটবল খেলতাম। দাদা মোটামুটি ভালো প্লেয়ার ছিল, ইস্কুলে ক্লাস-টিমে খেলত। আমাদের মামাতো ভাই-বোনেরা এবং মামার বাড়ির আশপাশের অন্য ছেলে-মেয়েরাও আমাদের সঙ্গে জুটে ওই বাতাবিলেবুর ফুটবল খেলত। সেবার গরমের ছুটির পরে আমরা যখন শহরে ফিরলাম, আমাদের সঙ্গে কয়েকজন মামাতো ভাই-বোন আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এল। গরমের ছুটি শেষ হওয়া মাত্র স্কুল খুলতেই শুরু হল বিভিন্ন ক্লাসের মধ্যে ফুটবল প্রতিযোগিতা। দাদা তখন ক্লাস সেভেনে পড়ে, সেভেনের টিমের রাইট আউটে খেলে। আমি কোনও চান্স-টান্স পাই না। সে যা হোক, সেদিন ক্লাস সেভেনের সঙ্গে ক্লাস এইটের খেলা। শক্ত টিম এইটের। দাদা খেলছে যথারীতি সেই রাইট আউটে। আমি, বিজন এবং আমাদের মামাতো ভাই-বোনেরা সবাই সে খেলা দেখছি লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে। খেলা ড্র চলছে। হঠাৎ দাদা সম্পূর্ণ অফসাইড থেকে একটা বল ধরল। গেমমাস্টার খগেনবাবু রেফারি ছিলেন, তিনি অফসাইডের হুইসিল দিলেন। কিন্তু দাদা থামল না, সরাসরি এক কিকে গোলে বল ঢুকিয়ে দিল। এইরকম পরপর চারবার। দাদা অফসাইড থেকে খগেনবাবুর বাঁশি অগ্রাহ্য করে চারবার গোলে বল পাঠাল। চারবারের মাথায় খগেনবাবু দাদাকে ধরলেন, "তুমি অফসাইড কাকে বলে জানো না?"

দাদা চুপ করে থেকে বলল, "জানি।"

"রেফারির বাঁশি বাজলে খেলা থামাতে হয় তুমি জানো না?" খগেনবাবু আবার প্রশ্ন করলেন।

দাদা আবার বলল, "জানি।"

খগেনবাবু তখন বললেন, "তবে?"

একটু চালাকের মতো হেসে দাদা বলল, "আমার মামাতো ভাই-বোনেরা মাঠের পাশে খেলা দেখতে এসেছে। এরা অফসাইড-টফসাইড কিছু বোঝে না। ওদের বলেছিলাম, চারটে গোল দেব। তাই ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে চারটে গোল দিলাম। দেখলেন তো ওরা কেমন হাততালি দিল।"

Pathagar.net

জবাগাছ

ওরকম, অত বড় জবাফুলের গাছ আর জীবনে দেখলাম না। আমাদের বাড়ির বাইরের বারান্দায় সিঁড়ির একপাশে দুটো গন্ধরাজ ফুলের গাছের মধ্যে ছিল সেই বিরাট জবাগাছটা, প্রায় একটা কলমের আমগাছের মতো বড়। ফুলগাছ নিচু হয়, মানুষের হাতের নাগালে থাকে, তাই কোনও পাখি তাতে বাসা বাঁধতে চায় না। কিন্তু আমাদের জবাফুলের গাছটায় এত ফুল, পাতা ডালপালা ছড়ানো-ছিটোনো ছিল যে, শুধু টুনটুনির মতো সরল পাখিই নয়, শালিকের মতো চালাক পাখিও নিশ্চিন্ত মনে বাসা বাঁধত, লম্বা এবং পাতাভরা গাছটাকে বেশ নিরাপদ বলেই জেনে গিয়েছিল পাখিরা। প্রতিদিন, সারা বছর ধরে রাশি রাশি ফুল ফুটত ওই গাছে। দিশি, লাল জবা, ঘন সবুজ পাতার মধ্যে উজ্জ্বল লাল রঙের বড় ফুলগুলি ঝলমল করত সমস্ত দিন। এই গাছটার ওপরে রাগ করে একবার আমি আর দাদা কুড়ুল দিয়ে কাটতে গিয়েছিলাম। তখন আমরা বেশ ছোট, প্রথম ভাগ-দ্বিতীয় ভাগের বয়েসে আছি, তাই আমাদের ক্ষমতা হয়নি কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে গাছটা কাটার, সেই জন্যে গাছটা রক্ষা পেয়েছিল.

বাইরের বারান্দায় একটা বড় তক্তাপোশে বসে প্রতিদিন বিকেলবেলায় আমি আব দাদা এক মারকুটে মাস্টারমশায়ের কাছে পড়তাম। কারণে অকারণে মাস্টারমশায় ওই জবাগাছ থেকে ডাল ভেঙে এনে শপাশপ মারতেন। তাই গাছটার ওপর আমাদের রাগ।

সে যা হোক, মাস্টারমশায় প্রায় প্রত্যেকদিনই বলতেন, তাঁর খুব মাথা ধরেছে। আমাদের ছাইভস্ম পড়াতেন, ডাল ভেঙে মারতেন আর ফাঁকে-ফাঁকে 'উঃ' করে নিজের মাথা টিপতেন। এই সময় একটা ঘটনা ঘটল। একদিন বিকেলে দাদা ঠাকুমাকে গিয়ে বলেছে, "আজ পড়ব না। খুব পেটব্যথা করছে।" ঠাকুমা বললেন, "ও কিছু নয়, তোমার পেট খালি, তোমার পেটে কিছু নেই, তাই ব্যথা করছে। কিছু খেয়ে নাও।" এর পরেই মাস্টারমশায় এসেছেন। এসে যথারীতি মাথা-ব্যথায় কাতরাচ্ছেন। দাদা দুম করে মাস্টারমশায়কে বলল, "আপনার মাথা-ব্যথা কেন আমি জানি।" তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, "কেন?" দাদা বলল, "আপনার মাথা একদম খালি আপনার মাথায় কিছু নেই, তাই ব্যথা করছে।" মাস্টারমশায় সচকিত হয়ে বললেন, "কে একথা বলেছে?" দাদা বলল, "ঠাকুমা এইমাত্র বলল।"

মাস্টারমশায় সেদিন সেই যে গেলেন, আর এলেন না। আমাদের আর জবাগাছ কেটে ফেলার দরকার পড়েনি।

হরিলুট

আমাদের উঠোনের একপাশে একটা বড় বেলগাছের নীচে একটা তুলসীমঞ্চ ছিল। সেখানে প্রতি সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালানো হত। প্রত্যেক পূর্ণিমার সন্ধ্যায় তুলসীমঞ্চটির অন্য একটা আকর্ষণ ছিল। ওখানে হরিলুট দেওয়া হত। অল্পবয়সীদের কাছে সেটা ছিল একটা বিশাল আনন্দ ও উত্তেজনার ব্যাপার।

হরিলুট ব্যাপারটা আর কিছু নয়, তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে চারপাশে সবাই বসে হাততালি দিয়ে হরিগান করা এবং গানের শেষে একটা বেতের ধামা থেকে উঠোনে বাতাসা ছিটিয়ে দেওয়া। এই বাতাসা ছড়ানোর ব্যাপারটা হল হরিলুট। হরিলুটের বাতাসা যে যতগুলো কুড়িয়ে নিতে পারবে ততগুলোই তার। রীতিমত হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি করে ছেলে-বুড়ো সবাই বাতাসা উঠোন থেকে কুড়িয়ে নিত।

বাতাসা কুড়োনোর পরে আর একটা ছোট পর্ব ছিল। কপালে হাতজোড় করে বাতাসা ঠেকিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে তারপরে বাতাসা খাওয়া হত।

এই প্রণাম করার সময় এক-একজন এক-এক রকম প্রার্থনা করত ভগবানের কাছে। পরীক্ষার মুখোমুখি আমরা পরীক্ষায় ভাল ফল যাতে হয় সেটা ঠাকুরকে দেখতে বলতাম। আমাদের বাড়িসুদ্ধ ভাই-বোনেদের মধ্যে কেউ-কেউ ছিল বেশ উদার প্রকৃতির। কেউ-কেউ প্রার্থনা করত, "জ্যাঠামশায়ের বাতের ব্যথাটা শিগ্‌গিরই সারিয়ে দাও।" কেউ বলত, "ঠাকুমার হাঁপানির টানটা একটু যেন কমে।" আমি নিজে বেশ কয়েকবার ভগবানকে অনুরোধ করেছি আমাদের মেনিবেড়ালের বাচ্চাগুলোর চোখ যেন তাড়াতাড়ি ফোটে কিংবা এই শীতে অন্তত একটা সাদা রঙের কুকুরছানা যেন আমাদের বাড়িতে জন্মায়। কারণ আমাদের একটাও সাদা কুকুর ছিল না।

আমরা সবাই চাইতাম আমাদের মনে যা আসত। আমরা কপালে বাতাসা ঠেকিয়ে বলতাম, "ঠাকুর, সব ঠিক করে দাও।" শুধু আমার আধখ্যাপা দাদা ছিল ব্যতিক্রম। দাদা বিড়বিড় করে সকলকে শুনিয়ে বলত, "ঠাকুর, মাত্র তিনটে বাতাসা পেলাম। কী আর বলব, আর কিছু চাই না। শুধু তুমি নিজে ঠিক থেকো, নিজের দিকে একটু নজর রেখো, হঠাৎ যদি তোমার কিছু খারাপ হয়, আমরা সবাই মিলে বেকায়দায় পড়ে ডুবব। ঠাকুর, নিজেকে একটু দেখো। তুমি ঠিক না থাকলে আমাদের সকলের ভরাডুবি।"

কলের গান

সিঁড়ির নীচে টানা লম্বা গুদামের মতো জায়গাটা ছিল আমাদের ভাঁড়ার ঘর। সে- ঘরে শুধু সারা বছরের চাল, ডাল, নারকেল থাকত তাই নয়, যত রাজ্যের জিনিস জমা পড়ত সেই অন্ধকার চোর-কোঠায়। বাড়ি থেকে চুরি করে পলাতক রান্নার ঠাকুরের ফেলে যাওয়া টিনের সুটকেস থেকে বাছুর থেকে বড় হয়ে যাওয়া গোরুর ছেলেবেলার গলার ঘণ্টা, বাসন-কোসন, পুজোর সাজসরঞ্জাম, বিচিত্র সব দ্রব্যে ভর্তি ছিল সেই ভাঁড়ার ঘর।

ভাঁড়ার ঘরে সকলের প্রবেশাধিকার ছিল না, শিশুদের তো নয়ই। কখনও কদাচিৎ আজিমার আঁচল ধরে সে-ঘরে ঢুকেছি। যেটুকু দেখতে পেতাম, সারি সারি সাজানো আচারের বয়াম, নাড়ুর হাঁড়ি, মোয়ার টিন, আর সবের অনিবার্য আকর্ষণ ছাড়াও খুব বেশি করে টানত অন্য দু'একটা আশ্চর্য জিনিস। তার মধ্যে একটা হল একটা বাতিল কলের গানের চোঙা।

কলের গান মানে রেকর্ড বাজিয়ে গান শোনার আদিম যন্ত্র। কোনও-কোনও রেকর্ডের লেবেলে আজও সে-যন্ত্রের ছবি আছে, একটা কুকুর চোঙায় কান পেতে কলের গান শুনছে।

ওই রকম একটা কলের গান ছিল আমাদের, সে-কল ভেঙে গিয়েছিল· কলের কোনও দোষ ছিল না। একবার আমাদের পাশের বাড়িতে একটা নতন পবিবার ভাড়া আসে, তাদেরও একটা কলের গান ছিল। আগে পুরো পাড়ায় ওই কল আমাদেরই একার ছিল, ফলে ওরা এসে গান বাজানো শুরু করলে আমাদের বাড়ির সকলের রক্ত মাথায় উঠে যায়।

একদিন যখন ওরা রাতে খাওয়া-দাওয়ার পরে গান বাজানো আরম্ভ করেছে, দাদা ছাদে উঠে ওদের বাড়ির দিকে চোঙার মুখ করে গান বাজানো আরম্ভ করল। ওরাও কী বুঝতে পেরে অল্প পরে ওদের যন্ত্র নিয়ে ছাদে উঠল। শুরু হল অবিশ্বাস্য এক প্রতিযোগিতা। সারারাত ধরে দুই বাড়ির ছাদে রেকর্ড বেজে চলল, সেই সঙ্গে সারারাত পাড়ার কুকুরেরা চেঁচাল। গাছের ডালের বাসায় কাকেরা সারারাত জেগে ডাকল, সেদিন নাকি কী বুঝে পুকুরপাড়ে শেয়ালরা তাদের বাঁধাধরা চিৎকার করতে সাহস পায়নি।

সেই যুদ্ধে আমাদের কল জয়ী হয়েছিল। পরের দিন সকাল দশটা নাগাদ আমাদের কলটি অকেজো হয়ে পড়ে। তখনও ওদেরটা বাজছে। তবে পরের মাসেই ওরা আমাদের শহর ছেড়ে চলে যায়। সে নাকি আমাদের কলের গানের তেজেই।

ভূগোলের ভুল

আমি আর দাদা বোধহয় বছর-দুয়েক একসঙ্গে পড়েছিলাম, ক্লাস সেভেন আর ক্লাস এইট, খুব সম্ভব এই দুই ক্লাস। দাদা মোটেই পড়াশুনা তৈরি করে ক্লাসে আসত না। সারাদিন এ-পাড়া ও-পাড়ায়, খালে-বিলে, বন-বাদায় ঘুরে বেড়াত। কখনও শিমুল গাছে উঠে ক্ষতবিক্ষত হয়ে নিয়ে আসত লাল টকটকে ফুলের গুচ্ছ, কখনও শরবনের ভেতর থেকে খুঁজে খুঁজে কুড়িয়ে আনত বুনো হাঁসের নীলচে ছোট-ছোট গোল-গোল ডিম।

ইস্কুলে, বাড়িতে এ-সব নিয়ে দাদা অনেক গালাগাল খেয়েছে, কিছু মারধরও জুটেছে কপালে, কিন্তু দাদা মোটেই শোধরায়নি। একদিন ব্যাকরণের ক্লাসে বিশিষ্টার্থক বাক্য রচনা শেখানো হচ্ছে, দাদা একটু দেরি করে ক্লাসে এল হাতে একটা গাছের ডাল, তাতে খুব ছোট ঝিরঝির ফুল, ফিকে রঙের। ক্লাসটিচার দাদাকে দেখে বললেন, "কী হে, তুমি যে একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছ।" দাদা তখন হাতের ভাঙা ডালটা দেখিয়ে বলল, "আমি নই স্যার, এই হল ডুমুরের ফুল। কবরখানার পিছনের মাঠ থেকে পেড়ে আনলাম। ডুমুর গাছটা ছেয়ে আছে ফুলে।"

সত্যি-মিথ্যে জানি না, দাদার দৌলতে জীবনে সেই একবারই আমি এবং আমার সহপাঠীরা (মাস্টারমশাই সমেত), ডুমুরের ফুল দেখি। এর আগে বা পরে আর কখনও দেখিনি।

অবশ্য ডুমুরের ফুলের চেয়ে অনেক ভয়াবহ কাণ্ড ঘটেছিল ভূগোলের ক্লাসে। ভূগোলের মাস্টারমশায়ের স্বভাব ছিল গোলমেলে প্রশ্ন করার। সেদিন কী কারণে দাদা প্রথম থেকেই ক্লাসে ছিল। উলটোপালটা প্রশ্ন করতে করতে মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করলেন, "মাউন্ট এভারেস্ট আবিষ্কার হওয়ার আগে সবচেয়ে উঁচু পর্বতচূড়া কী ছিল?"

ক্লাসে ছেলেরা যে-যার বুদ্ধি ও জ্ঞান অনুযায়ী বলল, "আলপস", "কারাকোরাম", "কাঞ্চনজঙ্ঘা" ইত্যাদি। দাদা এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মাস্টার-মশাইকে একদম বোকা বানিয়ে দিয়ে বলল, "আবিষ্কার হোক আর না হোক, তাতে কিছু আসে যায় না, মাউন্ট এভারেস্ট তো সব সময়েই ছিল। মাউন্ট এভারেস্ট আবিষ্কার হওয়ার আগেও ছিল সবচেয়ে উঁচু।"

Pathagar.net

গর্জন মামা

কিছুদিন হল নতুন মাস্টারমশায় এসেছেন। এই ভদ্রলোক একদিক থেকে ভালো, আগের মাস্টারমশায়ের মতো বেত-টেত মারা বা কানমলায় ঝোঁক নেই, কিন্তু ভয়ঙ্কর কড়া। যদিও গায়ে হাত তোলেন না, কিন্তু সর্বদাই রক্তচক্ষু, খড়্গহস্ত হয়ে বসে আছেন। ভীষণ কড়া নজর তাঁর, তাঁর কাছে কোনওরকম ফাঁকি দেওয়ার কথা ভাবাও অসম্ভব।

তা ছাড়া তিনি যেমন মিশকালো সেইসঙ্গে তাঁর সুপুষ্ট গোঁফ ইত্যাদি সহ দশাসই লম্বা-চওড়া চেহারা; এক-একটা হাতের থাবা বাঘের মতো, গলার আওয়াজ সিংহের মতো গমগমে, তাঁর নামও ছিল তেমনি ভয়াবহ, গর্জন ভট্টাচার্য। আমাদের মামার বাড়ির পাশের গ্রামের লোক, সেই সুবাদে আমরা ডাকতাম, গর্জনমামা।

আমি কিংবা দাদা কেউই তাঁকে মামা বলে ডাকার বিশেষ সুযোগ পাইনি। তাঁর সামনে কেমন থতমত খেয়ে থাকতাম। শেষের দিকে দাদার ভয় একটু কেটে গিয়েছিল এবং দু-একটা অবান্তর কিংবা দুঃসাহসী আলোচনা দাদা তাঁর সঙ্গে করার চেষ্টা করত। কিন্তু তিনি যতদিন আমাদের পড়িয়েছেন আমি আগাগোড়া তাঁকে ভয় করেছি।

গর্জনমামা কোনওরকমের ভুল করা একদম সহ্য করতে পারতেন না। যদি কখনও একটা অঙ্ক ভুল করতাম, সেই অঙ্কটা তিনি শুদ্ধ করে দেওয়ার পরে তাঁর সামনে বসে গুনে-গুনে পরপর দশবার সেই অঙ্কটা শুদ্ধ করে কষে তাঁকে দেখাতে হত, তবেই মুক্তি পাওয়া যেত।

আর ইংরেজি কিংবা বাংলা, কোনও রকমের বানান ভুল হলে তার পরিণতি ছিল ভয়াবহ। টানা একশোবার সেই বানান শুদ্ধ করে লিখতে হত। এতে আমাদের পড়াশোনার নিশ্চয়ই ভালো হত কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা ছিল খুবই ক্লান্তিকর আর একঘেয়ে। বড় হয়ে জেনেছি, একেই বলে শিরদাঁড়া-ভাঙা খাটুনি। বলা বাহুল্য, এ-খাটুনি আমাকে আর দাদাকে প্রায় নিয়মিতই খাটতে হত। কিন্তু ধীরে-ধীরে দাদা বিদ্রোহ শুরু করল। ব্যাপারটা চরমে উঠল সেদিন যেদিন দুটো অঙ্ক দাদাকে দশ-দশ বিশবার শুদ্ধ করে কষতে হল। তারপর তার সঙ্গে যোগ হল চারটে বানান চারশোবার। দাদা এত দ্রুত চারশোবার বানান লিখে ফেলল, গর্জনমামা ধরে ফেললেন, গুনে দেখলেন, দাদা যদিও বলছে প্রত্যেকটাই একশো করে লিখেছে আসলে কোনওটাই কুড়ি-পঁচিশবারের বেশি নয়।

ধরা পড়ে দাদা কিন্তু মোটেই ঘাবড়াল না, রীতিমতো তেজের সঙ্গে জবাব দিল, "একশোটা হয়েছে না কম হয়েছে তা আমি বলব কী করে। দেখছেন না, আমি অঙ্কেও কাঁচা, গুনতে পারি না।"

সাইকেল

আমার দাদা যে ক্লাস সেভেন থেকে এইটে ওঠার পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি, তার জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী ছিলেন আমার ছোটকাকা।

ব্যাপারটা খুবই দুঃখের। ক্লাস সেভেনের হাফ ইয়ারলি পরীক্ষাতে অন্য সব বিষয়ে মানে মানে পাস হয়ে গেলেও দাদা কিন্তু অঙ্কে উতরোতে পারল না। অঙ্ক পরীক্ষায় পেল মাত্র সতেরো।

দাদার রেজাল্ট দেখে বাড়ির সবাই খুব খাপ্পা এবং হতাশ হয়ে পড়ল। শুধু ছোটকাকা বললেন, "এতে এত চেঁচামেচির কী আছে? আমি তো সিক্সে না সেভেনে ইংরেজিতে পেয়েছিলাম মাত্র পনেরো। পরে কি আমি বি এ, এম এ পাস করিনি? এখন কি আমি গড়গড় করে ইংরেজি বলতে, লিখতে পারি না? আমি কি সাহেব-কোম্পানিতে চাকরি করছি না?"

দাদার দিকে ছোটকাকার চিরদিনই একটু টান বেশি ছিল, কিন্তু এবার তিনি তাঁর সদ্যপ্রাপ্ত সাহেব-কোম্পানির চাকরির দৌলতেই বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি করে ফেললেন। তিনি দাদাকে কবুল করলেন যে, সে যদি বার্ষিক পরীক্ষায় অঙ্কে কোনওরকমভাবে মোটামুটিও পাস করতে পারে তবে একটা ঝকঝকে নতুন সাইকেল উপহার পাবে। শুনে আমাদের খুব রাগ আর হিংসে হল। আমরা যারা সমস্ত বিষয়ে ভালোভাবে পাস হয়েছি আমাদের ছোটকাকা দুটো টাকাও উপহার দিলেন না। অথচ দাদার জন্যে নতুন সাইকেল।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু দাদার ভাগ্যে সাইকেলটা জোটেনি। ছোটকাকার দিক থেকে অবশ্য কোনও ত্রুটি হয়নি, দাদা নিজেই দায়ী ছিল ব্যাপারটার জন্যে।

সেবার অ্যানুয়ালে অঙ্ক পরীক্ষায় দাদা আরও খারাপ করল, পেল মোটমাট দশ। বড়দিনের ছুটিতে ছোটকাকা বাড়িতে এসে দাদাকে ধরলেন, "তোকে এত করে বলে গেলাম, অঙ্কটায় পাস কর, তা হলে একটা সাইকেল কিনে দেব, তাও ফেল হলি?"

দাদা গম্ভীর হয়ে বলল, "ওই জন্যেই তো ফেল হলাম।" উত্তর শুনে কাকা অবাক, জিজ্ঞেস করলেন, "তার মানে?" দাদা আরও গম্ভীর হয়ে জবাব দিল, "ওই সাইকেল চড়া শিখতে গিয়েই গত কয়েক মাস মোটেই অঙ্ক কষা হল না। আর শেষ পর্যন্ত সেইজন্যেই আমি ফেল হলাম। নিকুচি করেছে তোমার সাইকেলের।"

ম্যালেরিয়া

কী ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বর হত সে সময়! গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর মানুষ শীতে-গরমে সারাদিন লেপমুড়ি দিয়ে ঠকঠক করে কাঁপত। আর সে কী কাঁপুনি! এখনও ভাবলে শিহরন হয়।

সেবার এমন ম্যালেরিয়া হল আমাদের বাড়িতে যে, বাড়িসুদ্ধু সবাই, কাজের লোক, মুহুরিবাবুরা পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে কাঁপতে লাগলেন। সেবা-পথ্য দেখাশোনা করার কোনও লোক নেই। যার একটু জ্বর কমে বা ছেড়ে যায়, সে উঠে অন্যদের দ্যাখে। অবশেষে দশ মাইল দূরে গ্রামে আমাদের মামার বাড়িতে ঘোড়ার গাড়ি পাঠিয়ে 'ছোট দিদিমা'কে নিয়ে আসা হল আমাদের দেখাশোনা করার জন্যে। কিন্তু তিনি কী আর দেখবেন, তিনি নিজেই জ্বরে কাঁপতে-কাঁপতে ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামলেন।

সে যা হোক, জ্বর হলে ইস্কুলে যেতে হত না, এই এক বড় সান্ত্বনা ছিল। কিন্তু ম্যালেরিয়া ব্যাপারটা যত খারাপই হোক, তার চেয়ে অনেক বেশি খারাপ ছিল ম্যালেরিয়ার ওষুধ কুইনিন।

পৃথিবীর যেখানে যতবকম কুৎসিত তেতো জিনিস আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হল ওই ছোট গোল সাদা বড়ির কুইনিন। আজ এত বছর পরেও সে তেতো স্বাদ মনে পড়লে জিভ জড়িয়ে যায়। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হল, শুধু জ্বর হলে অসুখ সারানোর জন্যে নয়, যাতে জ্বর না হয় সেজন্যে, ভালো হয়ে গেলেও, আমাদের নিয়মিত জোর করে কুইনিন গেলানো হত। তবে মাঝে-মাঝেই বাজারে কুইনিনের আকাল হত, পাওয়া যেত না, আমরা ভাইয়েরা মহা আনন্দে থাকতাম। আমি আর বিজন কখনও-কখনও জোরজবরদস্তিতে কুইনিন খেতে বাধ্য হতাম। কিন্তু দাদাকে কুইনিন খাওয়ানো ছিল অসম্ভব ব্যাপার। একটা ঘটনা মনে আছে। আমাদের বুড়ো মুহুরিবাবুর খুব বাধ্য ছিল দাদা। তাঁর উপর দায়িত্ব পড়ে দাদাকে ওষুধ খাওয়ানোর। দাদা কিছুতেই খাবে না। অবশেষে মুহুরিবাবু বললেন, "পুরোটা না খেলে, অন্তত আধখানা খাও।" দাদা বলল, "খেতে পারি, কিন্তু বাকি আধখানা আপনাকে খেতে হবে।" মুহুরিবাবু অগত্যা তাতেই রাজি। সুপুরি-কাটা জাঁতি দিয়ে কুইনিন দু' টুকরো করা হল। তখনও দাদা খাবে না। বলল, "আপনি আগে খান।" তিনি তাই কবলেন, আধখানা বড়ি খেয়ে বাকি আধখানা দাদাকে এগিয়ে দিলেন। দাদা তখন সেটাকে একটু দেখে ফেরত দিয়ে বলল, "এটা আমার নয়। আমার ভাগের আধখানা আপনি খেয়ে ফেলেছেন। এটা আপনার আধখানা।"

হাতের লেখা

খারাপ হাতের লেখার জন্যে আমাদের বংশের লোকেরা বিখ্যাত। লেখাপড়া জানা শিক্ষিত ভদ্রলোকের হাতের লেখা যে এত হিজিবিজি, বাঁকাচোরা এবং ছেলেমানুষী ধরনের হতে পারে, আমাদের বাড়ির লোকদের হাতের লেখা না দেখলে তা প্রত্যয় হবে না।

এ-বিষয়ে সব চাইতে ডাকসাইটে লোক ছিলেন আমার জ্যাঠামশাই। তিনি খুবই নামকরা উকিল ছিলেন কিন্তু তাঁর হাতের লেখা এক তিনি নিজে এবং আমাদের বাসার আর এক-আধজন মাত্র পড়তে পারত। কোনও-কোনও সময় এমন হত যে, তাঁর হাতের লেখা তিনি নিজেও পড়ে কিছু বুঝতে পারতেন না। অনুমানে চালিয়ে দিতেন। সত্যি কথা বলতে কী, একটা আরশোলাকে কালির দোয়াতে চুবিয়ে কাগজের উপরে ছেড়ে দিলে যে-রকম বাঁকাচোরা ব্যাপার হয় আমার জ্যাঠামশাইয়ের হাতের লেখা প্রায় তাই ছিল।

উত্তরাধিকার সূত্রে হাতের লেখার এই পারিবারিক ঐতিহ্য আমি, দাদা এবং অন্যান্য ভাইয়েরা রক্ষা করেছি। তবে আমাদের মধ্যে দাদার হাতের লেখাই একটু ভালো ছিল। ধরে-ধরে লিখলে দাদার হাতের লেখা কিছুটা পরিষ্কার হত, চেষ্টা করলে পড়া যেত।

স্কুলের মাঝামাঝি ক্লাসে, অর্থাৎ ফাইভ-সিক্সে পড়ার সময় দাদার মাথায় ক্রমাগত নানান ধরনের বদবুদ্ধি চাপতে থাকে। ইস্কুলের মাস্টারমশাইয়েরা তখন দাদাকে উপদেশ দেওয়া শুরু করেছেন যে, 'তুমি একটু যত্ন করে লিখলেই তোমার হাতের লেখা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তোমাদের বাড়ির সকলের মতো বিচ্ছিরি লেখা আর তা হলে তোমার থাকবে না।'

এই পরামর্শে দাদা কী বুঝল কে জানে। কিন্তু এরপর থেকে দাদার হাতের লেখা খুব খারাপ হতে লাগল। সে রীতিমতো বিচ্ছিরি লেখা, তার পাঠোদ্ধার করে কার সাধ্য। সেই সময় আমি একদিন দাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোর তো বেশ গোটা-গোটা লেখা হচ্ছিল, আবার খারাপ হয়ে গেল কী করে?" দাদা মুচকি হেসে বলল, "হাতের লেখা খারাপ হলেই সুবিধে।" কথাটা শুনে আমি অবাক হয়ে বললাম, "মানে?" দাদা বলল, "হাতের লেখা পড়তে পারলে মাস্টারমশাইয়েরা খাতায় সব ভুল ধরে ফেলেন আর খারাপ হলে পড়তে পারেন না। কোনও ভুলও ধরতে পারেন না। বড়জোর পড়া যাচ্ছে না বলে রাগারাগি করেন।"

জলে কুমির

আমাদের বাড়ি থেকে কয়েক মাইল দূরে ছিল ধলেশ্বরী নদী। সে-নদীতে কুমির ছিল, শীতের দিনে তারা নদীর চড়ায় রোদ পোহাত। মাঝেমধ্যে বাছুর-ছাগল, গৃহস্থের হাঁস-মুরগি নদীর পাড়ে উঠে ধরত। কখনও-কখনও মানুষকেও আক্রমণ করেছে।

তবে আমরা ছেলেবেলায় যেখানে স্নান করতাম, বাড়ির সামনের পুকুরে অথবা কাছের খালে, সেখানে কুমির ছিল না। আমরা নির্ভয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্নান করতাম, সাঁতার কাটতাম, জল-কিত-কিত খেলতাম। কখনও ডুবসাঁতার দিয়ে পুকুরের ওপরে গিয়ে ভুস্ করে ভেসে উঠতাম। তিরিশ-চল্লিশ হাত ডুবসাঁতারে যাওয়ার মতো দম ছিল আমাদের।

জোঁকের ভয় ছিল গ্রামে মামার বাড়ির পুরনো পুকুরে। সে এক বীভৎস ব্যাপার। কুৎসিত, নোংরা জোঁকগুলো কখন অজান্তে শরীর কামড়ে ধরত, নুন দিয়ে জোঁক ছাড়িয়ে নেওয়ার পরেও দগদগে ঘায়ের মতো হয়ে থাকত জায়গাটা। জোঁক ছাড়াও নির্বিষ, জলসাপ ছিল সে পুকুরে, সেগুলো কামড়াত না, কিন্তু দেখলে খুব ঘেন্না করত। তবে জোঁক বা সাপ নয়, আমি আর দাদা দু'জনে একবার হাঙরের পাল্লায় পড়তে পড়তে বেঁচে যাই।

আমরা গিয়েছিলাম আমাদের জায়গা থেকে বহু দূরে চট্টগ্রামে কক্সবাজারের এক গ্রামে, এক আত্মীয়ের বাড়িতে, পৈতে না বিয়ে কিসের উপলক্ষে যেন। সেই গ্রামের এক প্রান্তে একটা ছায়াঢাকা খালের পাশে দাঁড়িয়ে গরমের বিকেলে ঠাণ্ডা কালো জল দেখে আমার আর দাদার স্নান করার খুব ইচ্ছে হল। জলে নামার আগে সাবধান হওয়ার জন্যে খালের পাশে একটু ঘাসের ওপরে এক মাতব্বর গোছের ব্যক্তি বসে হুঁকো খাচ্ছিলেন, তাঁকে দাদা জিজ্ঞেস করল, "চাচা, জলে কুমির নেই তো?" চাচা নির্বিকার এবং গম্ভীরভাবে বললেন, "না, এখানে কোনও কুমির নেই।" তবু জামাকাপড় ছেড়ে জলে পা দেওয়ার আগে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "চাচা, ঠিক তো? সত্যি কুমির নেই?" হাতের থেলো হুঁকোয় গুড়ুক গুড়ুক করে দুটো জোর টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে চাচা বললেন, "কুমির এখানে থাকবে কী করে। সব কুমির হাঙরের অত্যাচারে খালছাড়া হয়েছে, সব সমুদ্রে চলে গেছে।" বলাবাহুল্য, ওখানে আমাদের আর স্নান করা হয়নি।

কচুপোড়া

আমাদের সেই অনেক দূরের পাড়াগেঁয়ে শহরে আজকালকার মতো এত আশ্চর্য ও বিচিত্র সব খাবার মোটেই পাওয়া যেত না। চিনে খাবার বা বিরিয়ানি তো দূরের কথা, আমরা ছেলেবেলায় মোগলাই পরোটা কিংবা আইসক্রিম পর্যন্ত চোখে দেখিনি। তবে মালাই বরফ ছিল, টিনের চোঙা দিয়ে চামচে করে ছোট কাগজের টুকরোয় তুলে দেওয়া হত ধবধবে সাদা ঠাণ্ডা ক্ষীর। তা ছাড়া চানাচুর, বাদাম ছিল। আর ছিল ছোট-ছোট নোনতা, মুচমুচে চৌকো আকারের কটকটি-বিস্কুট।

তবে এর বাইরে মিষ্টির দোকানে পাওয়া যেত ক্ষীর-মাখানো আশ্চর্য চমচম, সেই সঙ্গে সন্দেশ, পানতুয়া আর বড়-বড় লালচে রঙের রসগোল্লা। খাঁটি দুধ দিয়ে তৈরি সে-সব মিষ্টির স্বাদই ছিল আলাদা।

সবার উপরে ছিল বাড়ির তৈরি খাবার। কত রকম যে মিষ্টির জিনিস আর নাড়ু-মোয়া তৈরি হত তার আর হিসেব করা যাবে না। মোয়া-মুড়কি নাড়ু-আমসত্ত্ব সবই মিষ্টি খাবার। চিঁড়ে-মুড়ি-খই থেকে শুরু করে বিন্নি-ঢ্যাপ কত রকমের যে মোয়া হত, আর কত রকমের নাড়ু। এ-সব ছাড়া পিঠে-পায়েস তো আছেই।

এই সব ভালো-ভালো খাবার আমাদের যেমন পছন্দ ছিল, তেমনই ছিল খারাপ-খারাপ খাবার। যেমন টোপাকুল কিংবা কাঁচা আম-মাখা। কাসুন্দি-জড়ানো পাকা বেতফল। কখনও বা নিছক নুন দিয়ে পাকা পাকা কামরাঙা কিংবা চালতে। সে-সব নিষিদ্ধ খাদ্যের স্বাদ ছিল আলাদা। এখনও জিবে জল আসে সে-সব খাবারের কথা মনে করলে।

এইরকম খারাপ-ভালো উলটো-পালটা খাবার খেয়ে বড় হতে-হতে একদিন আমাদের মাথায় দুর্বুদ্ধি চাপল। দাদা বলল, "সবাই রেগে গেলে বলে কচুপোড়া খাও। এত জিনিস খেলাম, একদিন ওই কচুপোড়া জিনিসটা খেয়ে দেখতে হবে।"

যেমন কথা, তেমনই কাজ। একটা বড় মানকচু ছাদে শুকোতে দেওয়া হয়েছিল। তার থেকে একটা টুকরো আমি সরিয়ে ফেললাম। রান্নাঘরে কাঠ দিয়ে রান্না হত। রান্না শেষ হওয়ার পরেও গনগনে আগুন থাকত উনুনে। ঘোর দুপুরে যখন বড়রা সবাই, এমনকী কাজের লোকেরা পর্যন্ত খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করছে, আমরা তিন ভাই গুটিগুটি রান্নাঘরে ঢুকে উনুনে কচু পোড়াতে দিলাম। কিছুক্ষণ পরে শিক দিয়ে খুঁচিয়ে উনুন থেকে গলিত, পোড়া একটা জিনিস দাদা উদ্ধার করে ভাগ করে আমাকে আর বিজনকে দিল। নিজেও অল্প নিল।

কীরকম লেগেছিল সেই কচুপোড়া?

সাঙ্ঘাতিক। শুধু কচু কেন, আমাদের জিবও পুড়ে গিয়েছিল। এরপর জীবনে আর কোনওদিন কচুপোড়া বা কচু-সেদ্ধ কেন, কচুর কোনও তরকারি খাইনি।

টাইপ-রাইটার

তখন আমার বন্ধুদের মধ্যে দু'-একজন সবে সিগারেট-টিগারেট খায়, সেও মোটামুটি লুকিয়ে-চুরিয়ে। দাদার বন্ধুরা কিন্তু মদ ধরেছে।

অনেকদিন আগের কথা। কলেজে পড়ার বয়স সেটা। আমি পড়তাম, দাদা কলেজ-টলেজে পড়েনি। লেখাপড়ায় দাদার মোটেই আস্থা ছিল না।

আমরা থাকতাম সেই কালীঘাটের পুরনো বাড়ির দোতলায়—পাশাপাশি দুটো ছোট ঘরে। ঘরের সামনে একটা একচিলতে পূর্বমুখী বারান্দা। সেই বারান্দায় দড়ি দিয়ে ঝোলানো ছিল একটা ঘণ্টা। ঘণ্টাটা পিতলের বা কাঁসার, ঠাকুমার পুজোর সামগ্রীর মধ্যে ওটা আমরা পেয়েছিলাম। বেশ ভারী, পুজো করার সময় পুরোহিতেরা যে রকম ঘণ্টা হাতে দুলিয়ে বাজান—সেই জাতের ঘণ্টা, তবে অপেক্ষাকৃত বড় সাইজের। আর শব্দটাও একটু গম্ভীর প্রকৃতির। ছোটবেলায় আমরা শুনেছি, দেশের বাড়িতে এ ঘণ্টাটাকে বলা হত কাঠমাণ্ডুর ঘণ্টা। কবে কোন্‌কালে কে যেন চৈত্র মাসে পশুপতিনাথের মেলায় গিয়ে কিনে এনেছিল। সেসব আমাদের জন্মের ঢের আগের কথা।

তবে একটা কথা বলে রাখি, শুধু এ কাঠমাণ্ডুর ঘণ্টাই নয়—এইরকম আমাদের বাড়ির অনেক জিনিসের গায়েই—সেগুলো যেখান থেকে এসেছে—সে জায়গার নামের ছাপ দেওয়া ছিল। কাশীর কলসী ছিল, ছিল পুরীর লাঠি, হরিদ্বারের থালা। আর শুধু জিনিসপত্রের কথা নয়, জীবজন্তু, গাছপালা—তার পরিচয়ও আমাদের জায়গা দিয়ে। দেওঘরের পেয়ারা বা ধামরাইয়ের কুলগাছ—সেও আমাদের দেশের বাড়িতেই ছিল এবং শুধু তাই নয়, আরো ছিল সরাইলের কুকুর আর ঢাকার বেড়াল।

জীবজন্তু বা গাছপালা দেশের বাড়ি থেকে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না, কিন্তু পাকিস্তান হওয়ার পরে জিনিসপত্র কিছু কিছু আমরা কলকাতায় কালীঘাটের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম—তার মধ্যে পুজোর জিনিসপত্র ছিল। বোধ হয় চিন্তাটা ছিল এরকম যে, পাকিস্তানে পুজোআচ্চা চলবে না, তাই পুজোর সামগ্রীই সবচেয়ে আগে আনা হয়েছিল। যার একটি ছিল ঐ কাঠমাণ্ডুর ঘণ্টা।

কাঠমাণ্ডুর ঘণ্টাটাকে আমরা দিশি কলিংবেল হিসেবে বারান্দায় টাঙিয়ে ছিলাম। বুদ্ধিটা ছিল দাদারই। ছাদের সঙ্গে দড়ি দিয়ে ঘণ্টাটাকে ঝুলিয়ে লম্বা পাটের দড়ির অন্য প্রান্ত সদর দরজার চৌকাঠের মাথায় একটা ফুটো করে রাস্তার দিকে বার করা ছিল। ঐ দড়ি ধরে টানলেই দোতলায় ঘণ্টা বেজে উঠত। অনিবার্য কারণে সদর দরজায় দড়িটা যেখানে বার করা ছিল, ঠিক সেখানে দাদা আলকাতরা দিয়ে বড় বড় হরফে কাঠের পাল্লার ওপরে লিখে দিয়েছিল, "দোতলায় ঘণ্টা বাজাইবার জন্য দড়ি একবার টানিবেন। বেশি টানিবেন না। ইহা গৃহস্থের বাড়ি, ফায়ার ব্রিগেড নহে। সাবধান!"

বলাবাহুল্য, এই নির্দেশনামাটি যথেষ্টই প্ররোচনামূলক ছিল। ফলে এটা পড়ে অনেকেই, অনেক ভালো লোক পর্যন্ত দড়ি ক্রমাগত টেনে যেত, যতক্ষণ পর্যন্ত দোতলার বারান্দায় কারো আবির্ভাব না হত। ফায়ার ব্রিগেডের মতো উচ্চ নাদে না হলেও ঢং ঢং করে বেজে যেত কাঠমাণ্ডুর ঘণ্টা।

সেদিনটা ছিল কালীপুজোর আগের দিন কিংবা আগের আগের দিন। আমাদের বাড়ির সামনেই ছিল পাড়ার কালীপুজোর মণ্ডপ। দুর্গাপুজো হত বড় রাস্তায় ট্রাম লাইনের কাছে, কালীপুজোটা পাড়ার মধ্যেই আমাদের বাড়ির উল্টোদিকের খালি তেকোনা জায়গায় হত। এখনো বোধ হয় তাই হয়।

সে যা হোক, সেদিন মণ্ডপে প্রতিমা নিয়ে আসা হয়েছে। আমি আর দাদা সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম রাত বারোটা পর্যন্ত কিংবা তারও বেশি। দুর্গাপুজোর সময় দাদা ব্যবসা করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছিল। পুজোমণ্ডপে দাদা শরবতের দোকান দিয়েছিল—'রায় স্পেশাল ড্রিঙ্ক'। লেমন জুসের সঙ্গে রোজ সিরাপ মিশিয়ে তিন রকম শরবত—হার্ড ড্রিঙ্ক, মিডিয়াম এবং সফট। কাঁচালঙ্কা বেটে রস করে একটা কাঁচের শিশিতে রাখা ছিল। হার্ড ড্রিঙ্কে দশ ফোঁটা, মিডিয়ামে পাঁচ ফোঁটা আর সফ্‌টে মাত্র এক ফোঁটা। হার্ডের দাম চার আনা, মিডিয়াম সাড়ে তিন আনা আর সফ্‌ট তিন আনা। অষ্টমীর দিন এক দুর্ঘটনায় সে শরবত বিক্রি বন্ধ হয়ে যায়। তবে তার আগেই বোঝা গিয়েছিল, জিনিসটা পাবলিক নেবে না। তখন খাঁটি কোকাকোলা চার আনা, লেমনেড, অরেঞ্জ তিন আনা। লোকে কেন দাদার এই গোলমেলে শরবত খেতে যাবে! তা ছাড়া সে বছর পুজোর সময় কাঁচালঙ্কার দাম দারুণ চড়া, পাঁচসিকে দেড় টাকা সের। তখন এক সের মাংসের দাম আড়াই টাকা, তার মানে দেড় টাকা সেরের লঙ্কা ভয়াবহ ব্যাপার। পাইকারিতে সস্তায় পাওয়া যাবে বলে একসঙ্গে পাঁচ সের কাঁচালঙ্কা সাত টাকায় কিনে দাদা রস করিয়েছিল।

দাম বেশি ছিল বটে, কিন্তু সে যে কী ঝাঁঝ ছিল সেই কাঁচালঙ্কাগুলোয়! ছাদে হামানদিস্তা দিয়ে লোক লাগিয়ে ছেঁচানো হয়েছিল সেই লঙ্কা, এর পর যাবতীয় চড়ুই, পায়রা আর কাক এক মাস বর্জন করেছিল আমাদের ছাদ। এমন কি লঙ্কার জ্বালায় পাড়ার বেড়ালগুলো পর্যন্ত আমাদের বাড়িমুখো হয়নি বেশ কয়েক সপ্তাহ।

আমাদের পিছনের বাড়ির এক বৃদ্ধ প্রতিদিন ভোরবেলা ছাদে উঠতেন সূর্যপ্রণাম করার জন্যে। থেঁতো লঙ্কার খোসাগুলো আমাদের ছাদের এক পাশে ডাঁই করে রাখা ছিল। চতুর্থী না পঞ্চমীর শেষরাতে একটু ঘূর্ণিঝড়ের মতো—এখনো কোন কোন বছর যে রকম হয় আর কি—ভোরবেলা মেঘ কেটে গিয়েছে কিন্তু তুমুল হাওয়া বইছে, দাদা হঠাৎ ছাদে উঠে গেল, আমাকে বলে গেল, 'বেদম হাওয়া উঠেছে, এবার লঙ্কার খোসাগুলো হাওয়ায় উড়িয়ে দিই, সব কালীঘাট আদিগঙ্গায় গিয়ে পড়বে, বিজনেস সিক্রেট গোপন করে ফেলি।'

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ভয়াবহ আর্ত চিৎকারে পুরনো কালীঘাটের ঘুমন্ত পাড়া চমকিয়ে জেগে ওঠে। সেই কাঁচালঙ্কার জ্বলন্ত খোসার ঝড় বয়ে গিয়েছিল বৃদ্ধ সূর্যপ্রণামকারীর ওপরে। তারপর ডাক্তার, হাসপাতাল। কাঁচালঙ্কার জ্বালায় আমাদের নিজেদেরও বেশ জ্বলতে হয়েছিল। দাদার কথা ছেড়ে দিচ্ছি, দাদার শোধবোধ ছিল না, আমার নিজের মুখ চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল। একসঙ্গে কয়েকশো পিঁপড়ে কামড়ালে যেমন যন্ত্রণা হওয়া সম্ভব, তাই হয়েছিল।

দাদার শিক্ষা হয়েছিল মহাষ্টমীর দিন। সপ্তমীর দিন শরবত ভাল বিক্রি হয়নি। পুজোর মেজাজ কোন বছরই সপ্তমীতে বিশেষ জমে না। জমাটি পুজো শুরু হয় অষ্টমীর সন্ধ্যা থেকে। শহর, শহরতলি, গ্রাম, গঞ্জ থেকে দলে দলে কাতারে কাতারে লোক এসে উপচিয়ে পড়ে

কলকাতার পুজোর প্যান্ডেলে। তখনই বেড়ে যায় খাওয়া-দাওয়া, ফুর্তির সওদা, কেনাবেচা।

দাদাও অষ্টমীর সন্ধ্যার জন্যে অপেক্ষা করে ছিল। কিন্তু গোলমাল হয়ে গেল দুপুরে।

কালীঘাট পাড়ায় চিরাচরিত রীতি অনুসারে মহিলারা অষ্টমীর দিন উপোস করেন। ঠিক নির্জলা উপোস নয়, ফল-শরবত এসব খাওয়া চলে। দুপুরবেলা সন্ধিপুজোর পরে যে মহিলারা অঞ্জলি দিতে এসেছিলেন, তাঁদের সবাইকে দাদা বিনি পয়সায় এক গেলাস করে শরবত উপহার দিলেন, বেশি করে লঙ্কার রস মেশানো স্পেশাল হার্ড ড্রিঙ্ক।

খালি পেটে সেই ঝাল সরবত দু'-এক চুমুক খেয়েই প্রায় সকলের মাথা ঘুরতে লাগল। অনেকে মণ্ডপেই বমি করে ফেলল। অনেকের বাসায় ফিরে গিয়ে পেটে ভয়ানক যন্ত্রণা হতে লাগল। ডাক্তার এসে বালতি বালতি নুন জল খাইয়ে গলায় আঙুল দিয়ে বমি করিয়ে পেট খালাস করে তাঁদের রক্ষা করলেন।

পুজো কর্তৃপক্ষ দাদার শরবতের ব্যবসা বন্ধ করে দিলেন। প্যান্ডেলের পাশে দোকান করার জন্যে দাদা পঞ্চাশ টাকা আগাম দিয়েছিল, কর্তৃপক্ষ সে টাকাও বাজেয়াপ্ত করলেন।

ওই কালীপুজোর আগের দিন রাত বারোটা এবং তারপরে পর্যন্ত আমি আর দাদা প্যান্ডেলে কর্তৃপক্ষদের ধরাধরি করছিলাম, ওই আগাম পঞ্চাশ টাকা ফেরত পাওয়ার জন্যে। কর্তৃপক্ষ তাঁদের সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন, এক পয়সাও ফেরত দেননি।

অনেক রাতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমরা শুয়েছিলাম। ঘুম আসতে না আসতে সদর দরজায় ধাক্কাধাক্কির শব্দে জেগে উঠলাম। আমাদের বাড়িতে কোনো অভিভাবক না থাকায় দাদার বন্ধুরা আজকাল কেউ কেউ মদ খেয়ে গভীর রাতে এসে হল্লা করে, বিরক্ত করে। ঘণ্টা-টণ্টা তারা বাজায় না, দরজা ধাক্কাধাক্কি করা মাতালদের খুব পছন্দ।

একটু পরে ধাক্কাধাক্কির সঙ্গে ঘণ্টাও বাজতে লাগল, বেশ জোরে এবং দ্রুতলয়ে। তাড়াতাড়ি চোখ কচলাতে কচলাতে বারান্দায় এসে দেখি, দরজার কাছে সোয়েটার গায়ে এক ব্যক্তি ধাক্কা দিচ্ছে আর একটু পিছে পাড়ারই একটি বখা ছেলে দড়ি টেনে ঘণ্টা বাজিয়ে তাকে সাহায্য করছে।

দাদাও বারান্দায় আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ওখান থেকে হেঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'কে রে ওখানে?'

দাদার গলার আওয়াজ পেয়ে পাড়ার ছেলেটি সরে গেল। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি, যার গায়ে সোয়েটার, সে বলল, 'মামু, আমি তমিজ। মকদমপুরের তমিজ।'

আমি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে তমিজকে উপরে নিয়ে এলাম। তমিজ মানে তমিজমামু। আমার মামাবাড়ির দেশের লোক। মামাবাড়িতেই কাজ করে। আমার মাকে দিদি বলে, গ্রাম সম্পর্কে আমরাও মামু বলি। তবে আমরা বাবুদের বাড়ির ছেলে বলে, আমরা বয়েসে অনেক ছোট হওয়া সত্ত্বেও তমিজমামু আমাদের নাম ধরে ডাকে না, দাদাকে বলে বড়মামু আর আমাকে বলে মাঝের মামু অর্থাৎ মেজমামু।

হেমন্তের শুরু, বাতাসে একটা হিম-হিম ভাব। কিন্তু সোয়েটার গায়ে দেওয়ার সময় কলকাতায় এখনও হয়নি। বারান্দায় উঠে দেওয়ালের পাশে একটা জলচৌকি ছিল, সেখানে তমিজমামু বসল। এ বাড়ি তমিজমামুর চেনা। মামার বাড়ি থেকে গত কয়েক বছর পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে জিনিসপত্র নিয়ে সে মাঝেমধ্যেই এখানে আসছে।

pathagar.net

বারান্দার আলোটা জ্বালিয়ে দিতে দেখলাম, সোয়েটার গায়ে দিয়ে তমিজমামু দরদর করে ঘামছে। শরীর থেকে সোয়েটারটা খুলতে খুলতে ভিতরের পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে দাদার হাতে দিয়ে তমিজমামু ডুকরে কেঁদে উঠল, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে! শেষরক্ষা করতে পারলাম না!'

আমরা খুব ঘাবড়িয়ে গেলাম। দেশে কেউ মারাটারা গেল নাকি, বুড়ো-বুড়ি বেশ কয়েকটা রয়েছে।

চিঠি পড়ে এবং তমিজমামুকে জেরা করে অবশ্য বোঝা গেল যে, ব্যাপারটা সত্যিই তেমন মারাত্মক কিছু নয়, অন্তত সর্বনাশ হওয়ার মতো নয়।

চিঠিটা আমার মাতামহের। দাদাকে এবং আমাকে যুগ্মভাবে লেখা। দীর্ঘ চিঠি, সে বিষয়ে পরে যাচ্ছি, আগে তমিজমামুর ব্যাপারটা বলি।

গ্রাম থেকে একটা পুরনো টাইপ-রাইটার যেটা আমার মাতামহ তাঁর পাটের অফিসের চিঠিপত্র লেখার কাজে ব্যবহার করতেন, আমাদের দু'ভাইকে পাঠিয়েছেন তিনি তমিজের মারফতে। বর্ডারে চেকপোস্ট দিয়ে এই টাইপ-রাইটার নিয়ে আসা যাবে না বলে তমিজমামু বর্ডারের কয়েক স্টেশন আগে ট্রেন থেকে নেমেছে। তারপরে সেখান থেকে ঘোড়ারগাড়িতে সাতক্ষীরা। সাতক্ষীরা থেকে নৌকোয় ভোমরা, বসিরহাট হয়ে কলকাতায়। কলকাতায় মানে কেষ্টপুরের খালে, এখন যেখানে সল্টলেক তারই পাশে। এরপর কেষ্টপুর থেকে কিছুটা পায়ে হেঁটে, তারপরে রিকশায়, শেষে বাসে।

সবশেষে নিরাপদে টাইপ-রাইটার নিয়ে ধর্মতলার মোড়ে নেমে যখন বাস বদলিয়ে কালীঘাটের বাসে উঠতে যাবে, তখন রাত প্রায় এগারোটা। এসপ্ল্যানেডের চারদিকটা কালীপুজোর মরসুম সত্ত্বেও নিঝুম হয়ে এসেছে। এসপ্ল্যানেডের বাস স্ট্যান্ডে যখন হাজরার বাসের জন্য তমিজমামু অপেক্ষা করছে, তিনজন সাদা পোশাকের পুলিশ এসে তাকে ধরে।

টাইপ-রাইটার ফুটপাতে নামানো ছিল। এদের মধ্যে একজন লাথি মেরে জিজ্ঞাসা করে, 'এ জিনিসটা কী?'

যখন তমিজমামু জানায় যে এটা টাইপ-রাইটার, তারা বলে, 'চোরাই মাল, চলো থানায়, যেতে হবে।' তমিজমামু অনেক অনুনয়-বিনয় করে কিন্তু তারা তাকে জোর করে বৌবাজার থানার কাছে নিয়ে যায়, তারপর থানার সামনে থেকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়, বলে যে, 'এখন ভাগো। তোমার যা বলার আছে কাল সকালে এসে বড়বাবুকে বলবে।'

তমিজমামুর বৃত্তান্ত শুনে আমরা খুব একটা বিচলিত হলাম না। পার্টিশনের পর বর্ডার পার করে জিনিস আনতে গিয়ে কত লোকের কত কিছু খোয়া গিয়েছে, এ তো সামান্য একটা পুরনো টাইপ-রাইটার! তাও ইংরেজি নয়, ফরাসী টাইপ-রাইটার!

ফরাসী টাইপ-রাইটারের ব্যাপারটা বলি। ফরাসী টাইপ-রাইটার ইংরেজি টাইপ-রাইটারের চেয়ে তেমন কিছু আলাদা নয়। যন্ত্রপাতি, অক্ষরাদি সবই-প্রায় একরকম, তবে কিছু কিছু ফরাসী অক্ষরের মাথায় একরকম চিহ্ন আছে, যা ইংরেজি অক্ষরে অনুপস্থিত।

টাইপ-রাইটারটি আমার মাতামহ উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন তাঁর খুল্লতাতের কাছ থেকে। আমাদের সেই খুল্ল প্রমাতামহকে আমরা খুব ছোটবেলায় দেখেছি। তিনি আগুন খেতে পারতেন। ইংরেজিতে যাকে বলে ফায়ার-ইটার, তিনি সেই ফায়ার-ইটার ছিলেন। যৌবনকালে তিনি আস্ত মশালের আলো গিলে খেতে পারতেন, গনগনে জ্বলন্ত

মশাল হাঁ করে মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতেন, সমস্ত আগুন নিঃশেষে খেয়ে নেবানো মশাল মুখ থেকে বার করে আনতেন। ও বিষয়ে তাঁর খুবই নামডাক ছিল, দূর-দূরান্তর এমন কি ঢাকা-কলকাতা পর্যন্ত তাঁর খ্যাতি বিস্তারিত হয়েছিল।

সতেরো-আঠারো বছর বয়েসে এনট্রান্স পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে সেই খুল্ল প্রমাতামহ বাড়ি থেকে পালিয়ে যান গারো পাহাড়ে। সেখানে মান্ধাই নামে এক পাহাড়ী উপজাতির সংস্রবে আসেন, তাদের কাছেই আগুন খাওয়া শেখেন এবং আরো অনেক কিছু।

দুরারোগ্য গোপন রোগের টোটকা চিকিৎসাও জানতেন তিনি। যত রাজ্যের যত দুশ্চরিত্র, দুশ্চরিত্রা এসে ভিড় করত তাঁর কাছে। কোন কোন কুলত্যাগিনীর সঙ্গে তাঁর নিজেরও নাকি গর্হিত সম্পর্ক ছিল। সে অপবাদ কখনও কখনও বাড়ির অন্যদের গায়েও লেগেছে।

এসব অনেককাল আগেকার কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হতে তখন ঢের বাকি। আমি, দাদা, আমরা কেউই তখনও জন্মাইনি। যাকে বলে গিয়ে 'বাবার বিয়ে', আমাদের বাবার বিয়ে পর্যন্ত হয়নি তখনও, মামারবাড়ি তো বহু দূরে।

সেই সময়ে ঢাকা শহরে এক ফরাসী যাদুকর খেলা দেখাতে এসেছিলেন। আমার মাতামহের কাকা নৌকোয় করে ঢাকায় গিয়ে সেই খেলা দেখেছিলেন। খেলার শেষে সেই ফরাসী যাদুকরের সঙ্গে দেখা করে তিনি তাঁকে নিজের আগুন খাওয়ার খেলা দেখান। অচিরেই দুজনার মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

ঢাকা থেকে খেলা দেখিয়ে চট্টগ্রাম হয়ে বার্মায় যান ফরাসী সাহেব। আমাদের মাতামহের ওই কাকাও তাঁর সঙ্গে যান। বার্মা থেকে ইন্দোচীন হয়ে দেশে চলে যাওয়ার সময় সাহেব তাঁর অনেক জিনিসপত্র—যার মধ্যে ওই টাইপ-রাইটারটিও ছিল—তাঁকে দিয়ে যান।

কালক্রমে টাইপ-রাইটারটি খারাপ হয়ে এসেছিল, তবে ব্যবহারযোগ্য ছিল। মাতামহের চিঠিতে জানা গেল যে, যন্ত্রটির সবই ঠিকঠাক আছে, শুধু ছোট হাতের 'এম' অক্ষরটি খসে পড়ে গেছে আর কতকগুলো অক্ষরের মাথায় চিহ্ন দেওয়া আছে।

এসব সমস্যা সম্পর্কে মাতামহ তাঁর চিঠিতে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে এক দীর্ঘ চিঠি, সম্পূর্ণ লিখতে গেলে গল্প মারা যাবে। পুরনো চিঠির তাড়া খুঁজে চিঠিটা বার করে শুধু অনিবার্য অংশটুকু উদ্ধৃত করছি ঃ

ওঁ ভগবান ভরসা।

নিরাপদে দীর্ঘজীবেষু

বাবাজীবনদ্বয়,

...এখন তোমাদের চারদিকে চাকুরির দরখাস্ত পাঠাইবার বয়েস হইয়াছে। হাতে লেখা দরখাস্ত সাহেবরা কোনকালে পাঠ করেন না। টাইপ করিয়া দরখাস্ত পাঠাইবার জন্য তোমাদের এই মেশিন পাঠাইলাম।

এই মেশিনটি খুবই সৌভাগ্যপ্রদ। ইহা ঘরে আসিবার পরই আমাদের পাটের ব্যবসা জমজমাট হইয়াছিল। এখন দেশকালের অবস্থা বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ভগ্নহৃদয়ে এবং তৎসঙ্গে বহু আশা করিয়া তোমাদের সৌভাগ্য কামনা করিয়া মেশিনটিকে পাঠাইলাম।

মেশিনটিতে যৎসামান্য খুঁত আছে। ছোট হাতের 'এম' অক্ষরটি নাই এবং কয়েকটি

অক্ষরের মাথায় শুভ সঙ্কেত আছে। চাকুরির আবেদনপত্র লিখিবার সময় চেষ্টা করিবে ছোট হাতের 'এম' অক্ষর যেন কোনো শব্দে না থাকে। একটু মনোযোগ দিয়া চেষ্টা করিলেই ইহা করা সম্ভব। যদি একান্তই 'এম' অক্ষর বাদ দেওয়া না যায়, তাহা হইলে টাইপ করার কালে ওই জায়গাগুলি ফাঁকা রাখিবে, টাইপ করা সম্পূর্ণ শেষ হইয়া গেলে কাগজ উলটাইয়া নিয়া শূন্য স্থানগুলিতে ডাবলিউ টাইপ করিয়া দিবে, কাহারও ধরিবার সাধ্য থাকিবে না।

শুভ সঙ্কেতগুলি রাখিয়া দিয়ো, ওইগুলি ফরাসী কেতার। ইংরাজি-পড়া সুশিক্ষিত সাহেবদের কাছে উহার কদর আছে।

ইতি ১২ কার্তিক, বুধবার বাংলা সম্বৎসর ১৩৬২

চির আশীর্বাদক,

তদীয় মাতামহ

বলাবাহুল্য, ওই দীর্ঘ পত্রে আরো বহু সদুপদেশ, ন্যায়বাক্য ও পরামর্শ ছিল। আমাদের পত্র পাঠ করা শেষ হওয়ামাত্র তমিজমামু আবার ডুকরে কেঁদে উঠল, 'এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল, বড়বাবুকে আমি কী করে মুখ দেখাবো?'

বড়বাবু মানে আমাদের মাতামহ। দাদা ধমকিয়ে উঠল, 'তুমি থামো তো তমিজমামু। বড়বাবুকে যা বোঝানোর আমি বোঝাব। তা ছাড়া কাল সকালে তো আমরা বৌবাজার থানায় যাচ্ছি টাইপ-রাইটার নিয়ে আসতে, এখন তুমি ঘুমোওগে।'

এই বলে দাদা ভেতরের ঘরে গিয়ে ছাদের টঙ থেকে পরপর তিনটে লেপ নামাল। এই লেপগুলোই গত বছর শীতে তমিজমামু এসে দিয়েছিল।

কিন্তু আজ অতগুলো লেপ দেখে ঘামন্ত তমিজমামু শিউরে উঠল, দাদাকে জিজ্ঞাসা করল, 'বড়মামু, এতো লেপ কী জন্যে?'

দাদা বলল, 'একটায় তুমি শোবে, একটা তুমি মাথায় দেবে, আরেকটা গায়ে দেবে।'

তমিজমামু বলল, 'এতো শীত কোথায়?'

দাদা তখন বলল, 'তা হলে এতক্ষণ সোয়েটার গায়ে দিয়ে ছিলে কী করে?'

পরদিন সকালে আমরা দু' ভাই আর তমিজমামু অসীম সাহসে ভর করে বৌবাজার থানা অভিমুখে রওনা হলাম। আমাদের দু' ভাইয়ের ইতিপূর্বে কোন থানার মধ্যে প্রবেশ করার কারণ বা সৌভাগ্য ঘটেনি। তমিজমামুর পুলিশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা একটু অন্য রকম। প্রথম যৌবনে রক্তের চাঞ্চল্যবশত তমিজমামু কিছুকাল ধলেশ্বরীতে নৌকো ডাকাতি করেছিল, তমিজ মিঞার বীরত্ব ও সাহসের কাহিনী শুনে আমার মাতামহ বহু কৌশলে ও অর্থব্যয়ে তাকে পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে এনে আমাদের পাটগুদামের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত করেন। পরে পাটগুদাম বন্ধ হয়ে গেলেও তমিজমামু মাতামহের কাছে থেকে যায়।

আজ সকালবেলা থানায় যাওয়ার সময় তমিজমামু কালকে রাতের সোয়েটারটা আবার গায়ে দিয়ে নিল। যদিও কার্তিক মাস, কিন্তু আজ সকালবেলা ঝনঝনে রোদ উঠেছে, বেশ গরম। এর মধ্যে তমিজমামুর গায়ে সোয়েটার দেখে আমরাও ঘামতে লাগলাম। দাদা বলল, 'আমরাও সোয়েটার গায়ে দিয়ে নেব নাকি?'

আমি বললাম, 'সে কি!'

দাদা বলল, 'থানায় মারধর করলে গায়ে সোয়েটার থাকলে চোট কম লাগবে।'

দাদার কথার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে তমিজমামু বলল, 'পুলিশের মারপিট সোয়েটার ঠেকাতে পারবে না। আমি সোয়েটার গায়ে দিলাম মনে বল আনার জন্যে। আঁটোসাঁটো পোশাক পরা থাকলে ভয় কম লাগে।'

কিছুক্ষণের মধ্যে বাসে করে এসপ্ল্যানেডে নেমে আমরা গুটি গুটি হেঁটে দুরুদুরু বক্ষে টাইপ-রাইটার পুনরুদ্ধার করার জন্যে বৌবাজার থানায় প্রবেশ করলাম।

থানা জায়গাটা যত ভীতিজনক ভেবেছিলাম, ঠিক তা নয়। সকালের দিক বলেই বোধ হয় থানার ভিতরটা প্রায় খালি। বড়বাবু দোতলায় না তিনতলায় বসবাস করেন, এখনও নামেননি। সামনের ঘরে টেবিলের ওপরে মাথা রেখে এই সাতসকালে ইউনিফর্ম পরা এক অফিসার ঘুমোচ্ছেন। তাঁর মাথার কাছে একটা হুলো বেড়াল চোখ বুজে গ-র-র করছে।

আমরা ভদ্রলোককে ওঠানোর চেষ্টা করতে গেটের সেপাই বলল, 'এখন তুলবেন না। কাল রাতে নাইট ডিউটি ছিল।'

একটু খোঁজখবর করতে বুঝলাম, কালীপুজো বলে এরকম ডিউটি প্রায় সকলেরই। কথা বলার লোক পাওয়া কঠিন। বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পর থানার মালবাবু এলেন। মালবাবু নামে যে কোন পদ থাকতে পারে, এ ধারণা আগে ছিল না। তবে মালবাবু লোক ভালো। আমাদের কথা মন দিয়ে শুনলেন। শুনে মাল-রেজিস্টার খুলে দেখে বললেন, 'না, কালকের তারিখে তো কোন টাইপ-রাইটার মেশিন জমা পড়েনি!' তারপর নিজে উঠে গিয়ে মালখানা খুলে দেখে বললেন, 'মালখানায় কোনও টাইপ-রাইটার নেই। কাল কেন, কোনদিনই জমা পড়েনি।'

আমরা হতাশ হয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এসে সামনের ফুটপাতে দাঁড়ালাম। খিদে লেগেছিল, কাছে একটা চায়ের দোকানে বসে চা আর কেক খেতে খেতে দাদা বলল, 'চল চাঁপাতলায়, পিসিমার ওখানে যাই।'

দাদার প্রস্তাবের পিছনে যুক্তি আছে। আমাদের এক দূর-সম্পর্কের পিসির শ্বশুরবাড়ি কাছেই বৌবাজার চাঁপাতলায়। পিসির শাশুড়ি কনকলতা দেবী অতি ডাকসাইটে মহিলা। অনেককাল আগে বৌবাজার কালীবাড়িতে তখনকার বৌবাজার থানার বড়বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সেই সূত্র ধরে কালক্রমে সমস্ত বড়বাবুর স্ত্রী এবং সেই সঙ্গে থানার বড়বাবুসমেত সেপাই-দারোগা সকলের সঙ্গে তাঁর গভীর ঘনিষ্ঠতা। কালীবাড়িতে তাদের হয়ে তিনি মানত দেন। পুলিশের সঙ্গে তাঁর এই সৌহার্দ্যের বিষয় আত্মীয়স্বজন সকলেরই জানা ছিল এবং এতে আমরা বিশেষ গৌরবান্বিত বোধ করতাম।

আমরা যখন চাঁপাতলায় পিসির শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন কনকলতা দেবী পুজোর ঘরে রয়েছেন। আমরা এসেছি শুনে তিনি একটু পরে বেরিয়ে এলেন। কাজের লোকদের বললেন আমাদের জলখাবার দিতে। তারপর আমাদের, বিশেষ করে তমিজমামুর কাছে বিস্তারিত শুনলেন। শোনার পর একটু থেমে গম্ভীর গলায় স্বগতোক্তি করলেন, 'কি সাহস, টাইপ-আইটার কেড়ে নিয়েছে!' ভদ্রমহিলা আদ্যে'র উচ্চারণ করতে পারতেন না, রামকে 'আম' বলতেন. রাইটার 'আইটার' হয়ে গেল।

পুরনো আমলের বনেদি বাড়ি। ভেতরের বারান্দায় বড় কালো টেবিলের ওপরে টেলিফোন

রয়েছে। কনকলতা আমাদের সেখানে নিয়ে গেলেন। তারপর দাদাকে বললেন, ফোনে বৌবাজার থানা ধরতে। ডিরেকটরি দেখে একটু চেষ্টা করতে বৌবাজার থানা পাওয়া গেল।

এবার কনকলতা দেবীর নির্দেশমত বিচিত্র কথোপকথন শুরু হল। বেলা প্রায় বারোটা হতে চলল, মনে হল, থানায় ইতিমধ্যে অনেক লোক এসে গেছে। দাদা ফোনে জানাল যে, কনকলতা দেবীর বাড়ি থেকে বলছি। তাতে বেশ সাড়া পাওয়া গেল এবং বোঝা গেল যে কনকলতা দেবীর প্রভাব থানার ওপরে যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যমান।

থানার সঙ্গে দাদার কথোপকথন চলল কনকলতা দেবীর নির্দেশে, দাদা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কে বলছেন?' সাধারণত থানা কিংবা কোন সরকারি অফিস থেকে এজাতীয় প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া যায় না, কিন্তু দাদার মুখ দেখে বোঝা গেল উত্তর এসেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দাদা সেটা রিলে করে দিল, 'রমেশ চক্রবর্তী'।

সঙ্গে সঙ্গে কনকলতা দেবী বললেন, 'জিজ্ঞেস করো, কোন অমেশ?'

এখানে এই ব্যাপারটার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সেই সময়ে বৌবাজার থানায় দুজন রমেশ চক্রবর্তী ছিলেন, দুজনেই এ-এস-আই বা ছোট দারোগা। এসব ক্ষেত্রে যেমন হয়, আসামী-ইনফরমার-সেপাই—থানার কাছাকাছি ও আশেপাশের লোকজন একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য রচনা করেছিল দুজনের মধ্যে, তারা যে কোন কারণেই হোক একজনকে বলত 'চালাক রমেশ' অন্যজনকে বলত 'বোকা রমেশ'। এসব খবর আমরা পরে জেনেছিলাম। কিন্তু সেদিন ফোনে দাদা বাধ্য বালকের মতো যখন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোন রমেশ?' ও প্রান্ত থেকে স্পষ্ট উত্তর এল, 'আপনি দিদিমাকে বলুন, আমি বোকা রমেশ।'

বলাবাহুল্য, বোকা রমেশ চক্রবর্তীকে সবাই যতো বোকা ভাবত, হয়তো তিনি তা ছিলেন না। তা হলে অন্তত তিনি জানাতে পারতেন না যে তিনিই বোকা রমেশ। সে সব অন্য কথা। আসল কথা হল, এবার কনকলতা দেবী ফোনটা দাদার হাত থেকে তুলে নিলেন এবং যথাসম্ভব অপ্রাকৃত ভাষায় বোকা রমেশ চক্রবর্তীকে জানালেন পুলিশ বাহিনীর অপদার্থতা বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত মতামত এবং তমিজমামুর টাইপ-আইটারের করুণ কাহিনী।

মহানুভব লোক ছিলেন বোকা রমেশ চক্রবর্তী। তিনি কনকলতা দেবীকে বললেন, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থানায় পাঠিয়ে দিতে। কনকলতা বললেন, 'এখন নয়, ওরা দুপুরে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করে তিনটে নাগাদ যাবে।'

সেদিন দুপুরে অনেকদিন পরে পিসির হাতের রান্না খেলাম। মুলোশাক ভাজা, লাউচিংড়ি, মিষ্টি কুমড়োর চাপরঘণ্ট, বোয়াল মাছের ঝাল, নতুন আলুকপি দিয়ে রুই মাছের ঝোল আর সবশেষে অনবদ্য মাছের ল্যাজা আর শালুকের টক। মনে হচ্ছিল দেশে ফিরে গেছি। একটু গাঁইগুঁই করে আমাদের পাশে বসে তমিজমামুও খেল। চাঁপাতলা লেনের সেই বাড়িতে কেউ খেয়াল করতে যায়নি আমাদের তমিজমামু ব্রাহ্মণ কিংবা হিন্দু কি না। দেশের বাড়িতে এ গোলমালটা তখনও ছিল।

সোয়া তিনটে নাগাদ থানায় গেলাম। অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ। গেটের সেপাই আমাদের দেখে কী করে কী বুঝল কে জানে, জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা রমেশবাবুর কাছে যাবেন?'

দাদা চালাকি করে জিজ্ঞেস করল, 'কোন রমেশবাবু?'

সেপাই গলা নামিয়ে বলল, 'বোকা রমেশবাবু। সামনের বাঁদিকের ঘরে আছেন।' বলে চোখের কোণে এক ঝিলিক হাসল।

সামনের বাঁদিকের ঘরে ঢুকে গেলাম। একটা টেবিলের পিছনে চেয়ার জুড়ে গোলগাল নাদুসনুদুস এক ভদ্রলোক বসে রয়েছেন। যদিও পুলিসের পোশাক কিন্তু চেহারায় কেমন ভালো মানুষের ভাব, ইনিই নিশ্চয় বোকা রমেশবাবু। তাঁর পাশে মেঝের ওপরে দুটো লোক হাঁটু মুড়ে বসে রয়েছে। লোক দুটোকে দেখেই তমিজমামু চেঁচিয়ে উঠলো, 'এই তো, এ দুজন! আরো একজন ছিল।'

কোনরকম পরিচয় বিনিময় করার আগেই রমেশবাবু বললেন, 'আপনারা এসে গেছেন, ভালোই হয়েছে। এ দুটোকে ধরে এনেছি। তিন নম্বরটাকে ধরা যায়নি। তবে যাবে কোথায়?' তারপর টেবিল থেকে একটা কালো কাঠের রুল তুলে মেঝেয় বসা লোকদুটোর পেটে দুটো খোঁচা দিয়ে বললেন, 'এগুলো পাকা জোচ্চোর। থানার নাম করে লোকের মাল কেড়ে নেয়।'

ওই দুজনের মধ্যে একজন ফিরিঙ্গি চুলের রঙ লাল, চোখের রঙ কটা, গায়ের রঙ সাদা—তাকে চুলের মুঠি ধরে দাঁড় করালেন রমেশবাবু। তারপর আমাদের বললেন, 'এর নাম পিটার। মহা শয়তান। এটাই পালের গোদা। এর সঙ্গে যান, টাইপ-রাইটার ফেরত দিয়ে দেবে।' তারপর দ্বিতীয় লোকটাকে একটা লাথি মেরে বললেন, 'যা ভাগ।'

আমরা বেরোতে বেরোতে শুনলাম, পেছন থেকে রমেশবাবু বলছেন, 'কোনো চালাকি করতে যেয়ো না পিটার, তা হলে একদম ডাকাতির মামলায় জুড়ে দেব।'

আমরা রাস্তায় নেমে পিটারের সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম। পিটার লোকটি জোচ্চোর কিন্তু সজ্জন, সে আমাদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে চমৎকার তালতলার বাংলায় বলল, 'স্যার, আপনাদের নিয়ে যেতে লজ্জা করছে। আমরা কিন্তু খুব খারাপ জায়গায় যাচ্ছি।'

আমি আর তমিজমামু মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলাম। দাদা জিজ্ঞাসা করল, 'খারাপ জায়গা কেন?'

পিটার খুব সঙ্কুচিত হয়ে বলল, 'স্যার—আমার স্বভাবদোষ। কাল রাতে মেশিনটা আমি জলিকে দিয়ে এসেছি।'

দাদা বলল, 'জলি? জলি আবার কে?'

পিটার আরও সঙ্কুচিত হয়ে বলল, 'জলি খুব বাজে মেয়ে স্যার। খারাপ পাড়ার মেয়ে। মাঝে মাঝে ওর ওখানে যাই। সব সময় টাকা দিতে পারি না, কাল ওই মেশিনটা দিয়ে এসেছি।'

ততক্ষণে আমরা হাঁটতে হাঁটতে চৌরঙ্গির মোড় পার হয়ে বাঁদিক ধরে জানবাজারের কাছে এসে পড়েছি। সত্যিই গোলমেলে জায়গা, কার্তিক মাসের পড়ন্ত বিকেল, একটু- ছায়া ছায়া অন্ধকার ভাব। এরই মধ্যে দালাল আর নষ্ট মেয়েছেলেরা রাস্তায় নেমে পড়েছে।

পরিবেশ বুঝতে আমাদের কোনই অসুবিধে হচ্ছিল না, কালীঘাটে আমাদের বাড়ির পিছনেই খারাপ পল্লী, আর তমিজমামুও পাকা লোক।

একটি পুরনো দোতলাবাড়ির প্যাসেজে কয়েকটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও চীনে মেয়ে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে, তারা পিটারকে দেখে চিনতে পারল। একজন বলল, 'হ্যালো পিটার?'

পিটার জিজ্ঞাসা করল, 'জলি কাঁহা? হোয়ার ইস জলি?' জানা গেল জলি ঘরে আছে।

এ জায়গা পিটারের বেশ চেনা। সে আমাদের নিয়ে দোতলায় উঠল। সিঁড়ির শেষ মাথায় জলির ঘর। ঘরের সামনে মোটা পর্দা। পিটার আমাদের বলল, 'আসুন।' বলে

pathagar.net

হন হন করে এগিয়ে গেল, তমিজমামু একবার গলাখাঁকারি দিল, দাদা দরজায় দুবার ঠুকঠাক করল, ভেতর থেকে সুললিত মেমকণ্ঠে জবাব এল, 'সরি, আই অ্যাম বিজি।'

ঘরের মধ্যে ঢুকে কী দৃশ্য দেখব কি জানি, আমরা থমকে গেলাম। পিটার কিন্তু পর্দা সরিয়ে ঢুকে গেল। ঢুকে আমাদের ডাকল, 'আসুন স্যার, আপনারা আসুন।'

একটু ইতস্তত করে আমরা ঢুকলাম। ঘরে ঢুকে দেখি একটা ডবলবেডের খাটের পাশে একটা ছোট গোল টেবিল। সেই টেবিলে আমাদের টাইপ-রাইটারটা বসানো। সামনে খাটে বসে একটি মেয়ে সেই মেশিনে কাগজ লাগিয়ে একমনে কি সব টাইপ করে যাচ্ছে।

অল্পবয়সী ফিরিঙ্গি মেয়ে, একুশ বাইশের বেশি হবে না। রঙ তত ফর্সা নয়, কিন্তু বড় বড় দুটি নীল চোখ, মুখে বেশ কমনীয়তা। শরীরে যৌবনের মাদকতা।

পিটার মেয়েটিকে বলল, 'জলি, ভেরি স্যরি। মেশিনটা ফেরত দিতে হবে। এঁরা নিতে এসেছেন।'

টাইপ করা থামিয়ে জলি অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকাল। একটু পরে খাট থেকে নেমে উঠে দাঁড়াল, তারপর পিটারকে বলল, 'অলরাইট, নিয়ে যেও। আমার পাওনা টাকাগুলো মিটিয়ে দিয়ো!' বলে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

দাদা হঠাৎ তার পথ আগলিয়ে দাঁড়াল, প্রশ্ন করল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

জলি বলল, 'আপনি কী করবেন জেনে? নিজের কাজে যাচ্ছি। আপনারা আপনাদের মেশিন নিয়ে চলে যান।'

দাদা কী ভাবল কে জানে, জলিকে জিজ্ঞাসা করল, 'টাইপ মেশিনটা তুমি চাও? তুমি টাইপ করতে পারো?' কিছু না বলে জলি থমথমে মুখে দাদার দিকে তাকাল। আমি আর তমিজমামু নিষেধ করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই দাদা জলিকে বলল, 'ভালো মেয়ে হও। ভালো পথে থেকে উপার্জন করো। মেশিনটা তোমাকে দিয়ে দিলাম। এখন থেকে সৎভাবে থাকো।'

পিটার হাঁ করে দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর আমাকে বলল, 'স্যার, বোকা রমেশবাবু কী বলবে?'

তমিজমামু হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর দাদাকে বলল, 'বড়মামু, বড়বাবু কী বলবে?'

আমি হাঁ করে জলির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

পরের দিন তমিজমামু দেশে ফিরে গেল।

দাদা তার হাতে চিঠি দিয়ে দিল, 'শ্রীচরণকমলেষু, টাইপ-রাইটার পাইয়া খুব খুশি হইয়াছি।' ইত্যাদি।

দাদার কিন্তু এর পর কাজ বেড়ে গেল। দু'-এক দিন পরে হাজরার মোড়ে একটা সাইনবোর্ডের দোকান থেকে ইংরেজি এবং বাংলায় 'টাইপিং ডান হিয়ার', 'এখানে টাইপ করা হয়' একটা ছোট বোর্ডে লিখিয়ে জলিদের বাড়ির গেটে লাগিয়ে দিয়ে আসে। বাড়িউলি সামান্য আপত্তি করেছিল, তাকে দাদা বোকা রমেশ দারোগার ভয় দেখায়

এর পরেও দাদা মধ্যে মধ্যে জলির ওখানে যেত। জলি সত্যিই সচ্চরিত্র জীবনযাপন করছে কিনা দেখবার জন্যে।

তবে সে অন্য গল্প।

pathagar.net

জানালা

জানালাটা আমাদের সঙ্গে অনেক দিন আছে। ওরিয়েন্টাল স্কুলের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান হয় উনিশ শো ঊনষাট কিংবা ষাট সালে। সেই সময় পুরনো বাংলা ইঁটের গাঁথা চব্বিশ ইঞ্চি দেওয়ালের সাবেকী দালান ভেঙে নতুন সেন্টেনারি বিলডিং তোলা হয়। পুরনো দালানের মালমশলা, ইঁট-কাঠ, জানালা-দরজা সব নিলামে বিক্রি করে দেওয়া হয়।

কী বুদ্ধি করে দাদা ঐ নিলাম থেকে জানালাটা কিনে এনেছিলো, শুধু ঐ একটা মাত্র জানালা, আর কিছু নয়।

রীতিমতো ভারী জানালাটা। প্রায় আধ মণ কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশি ওজনের হবে। নিলামের জায়গা থেকে কিনে দাদা সেটা নিজে বয়ে আনতে পারেনি, একটা রিকশায় করে নিয়ে এসেছে।

কালীঘাটের বাড়ির সামনে ফুটপাতে রিকশা থেকে নেমে দাদা ডাকাডাকি করতে আমি দোতলা থেকে নিচে নেমে এলাম। তারপর আমি, দাদা আর রিকশাওয়ালা ধরাধরি করে জানালাটাকে রিকশা থেকে নামালাম।

জানালাটা নামানোর পর দাদা আমাকে বললো, ওরিয়েন্টালের নিলাম থেকে কিনে আনলাম। একশো বছরের পুরনো জিনিস। খাঁটি বার্মা মেহগনি, এসব আর আজকাল পাওয়া যাবে না।'

দাদার কথায় রিকশাওয়ালাও সায় দিলো, 'বহুত আচ্ছা জানেলা।' একশো বছরের ব্যাপারটা কী করে সেও বুঝতে পেরেছে, সে দাদাকে তাল দিয়ে বললো, একশো বছরের জানালা আরো একশো বছর যাবে।

এদের অত্যুৎসাহ দেখে দাদাকে আমি আর বলতে পারলাম না যে, ইস্কুলের বয়স একশো বছর হয়েছে ঠিকই, কিন্তু যে দালানটা ভাঙা হয়েছে, সেটাও সেই বয়েসী হবে এমন কোনো কথা নেই, দালানটা পরেও তৈরি হয়ে থাকতে পারে, প্রথমে হয়তো একটা চালাঘরে ইস্কুল শুরু হয়েছিলো।

কিন্তু এসব তো অন্য কথা, কিছুর মধ্যে কিছু নয়, দাদা হঠাৎ নিলাম থেকে ভারী জানালাটা কিনে নিয়ে এলো কেন, আমি বুঝতে পারছিলাম না।

যে কোনো ইস্কুলের জানালার মতই এই জানালাব আরো কিছু স্মৃতিচিহ্ন আছে। পেন্সিল-কাটা ছুরিতে কিংবা ব্লেডে খোদাই করা অনেক নাম—নৃপেন, রাধানারায়ণ, শহীদুল থেকে শুরু করে আধুনিক পরাগ, বশিষ্ঠ ইত্যাদি। দ্বিতীয় যুদ্ধের কিছু পরে ওরিয়েন্টালে সকালে মর্নিং ক্লাস শুরু হয় মেয়েদের দিয়ে। তবে মেয়েরা ছুরি দিয়ে কাঠ খোদাই করে সচরাচর নিজের নাম লেখে না। শুধু এক জায়গায় দেখলাম, শুধু নাম নয়, বেশ আত্মপ্রচার রয়েছে, লেখা আছে 'আমি সরসী'।

আমার বিমূঢ় ভাব দেখে দাদা একটু বোকার মত হেসে বললো, 'সাবেকী জিনিস, সস্তায় পেয়ে গেলাম, মাত্র সাড়ে সতেরো টাকায়।'

কিন্তু শুধু নামাবলী নয়, জানালাটার সঙ্গে আরো কিছু কিছু জ্ঞানের বিষয় আমরা পেয়ে গেলাম। জানালার ডান দিকের পাল্লার নিচের দিকে খুদে খুদে অক্ষরে ত্রিভুজের

তিন কোণ যে দুই সমকোণের সমান তার সচিত্র প্রমাণ রয়েছে। আরেক জায়গায় কাবেরী, গোদাবরী, নর্মদা ওই সব নদীর নাম লেখা রয়েছে, দাদা সেদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে আমাকে বললো, 'এগুলো দক্ষিণ ভারতের নদীর নাম, প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।' যেন জানালাটা না আনলে এসব নদীর নাম আর কখনো জানা যেত না, আমাদের মহা ক্ষতি হত।

এতদিনেও অস্পষ্ট হয়নি, কিন্তু এইসব লেখাগুলো! পেন্সিলে, দুয়েকটা কালো কালিতে, শুধু এক জায়গায় নীল পেন্সিলে চমৎকার নিটোল অক্ষরে লেখা আছে, 'চৈত্রদিনের ঝরা পাতার পথে'। এও কী কোনো স্কুলের ছাত্রের লেখা?

জানালাটা আমরা ধরাধরি করে দোতলায় তুললাম। ওপরে উঠে জানালাটা নামিয়ে আমি দাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'শুধু একটা জানালা, এই জানালাটা আমাদের কী কাজে লাগবে?'

দাদা প্রশ্নটা একটু এড়িয়ে গেলো, শুধু বললো, 'কখন কী কাজে লাগে কিছু কি বলা যায়! সদর দরজার পাশে লাগাতে পারি, বাড়ির চেহারা খুলে যাবে।'

আমি বললাম, 'সদর দরজার পাশে এত বড় জানালা লাগানোর জায়গা কোথায়?' দাদা চুপ করে রইলো।

সেই থেকে জানালাটা আমাদের সঙ্গে রয়েছে।

দাদা অনেকদিন নেই। কালীঘাটের বাড়িও নেই। কালীঘাটের বাড়ি ছেড়ে গেলাম তারাতলায় সরকারি আবাসনে। জানালাটা ফেলেই আসছিলাম, শেষ মুহূর্তে আমার ছোট ভাই বিজন সেটাকে ট্রাকে তুলে দিলো।

তারপরে বাসা বদল হলো আরো দু'বার। জানালাটা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। পণ্ডিতিয়ায় ছোট বাড়িতে এত বড় একটা জানালা নিয়ে অসুবিধেই হয়েছিলো! বেশ কয়েক বছর পড়েছিলো উঠোনের একপাশে রোদে বৃষ্টিতে, তবে জানালার কাজই তো রোদ-বৃষ্টি ঠেকানো, এই ভেবে মাথা ঘামাইনি।

পণ্ডিতিয়ার বাসা ছেড়ে দো-আঁশলা পাড়ার এখনকার এই বাসায় এসেছি, সেও অনেকদিন। জানালাটা এখনো আছে। বিজনের ঘরে একটা জানালার নিচে হেলান দিয়ে রাখা আছে ওটা।

জানি না, জানালাটা আমাদের কবে কী কাজে লাগবে। ভেবেছিলাম নিজে যদি কখনো বাড়ি বানাই, সেই বাড়ির কোথাও এই জানালাটা লাগিয়ে দেবো। কিন্তু এত বড়, বেখাপ্পা একটা জানালা একালের বাড়িতে কীভাবে ব্যবহার করা যাবে, সে বিষয়েও প্রশ্ন রয়েছে। আমার এক বাস্তুকার বন্ধু বলেছিলেন, 'অসম্ভব!'

সম্ভব অসম্ভব যাই হোক, এখনো আমার নিজের কোনো বাড়ি নেই। কখনো হবে কি না, তাও জানি না। কিন্তু একটা জানালা আমার কাছে রয়ে গেছে।

একা একা একেক সময় জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। গ্রামের দিকে একটা বাড়ি করার কথা ভাবি। জানালাটার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে কলকাকলি ভেসে আসে। কখনো জানালার ওপারে দেখি, ঝাড়গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে সবুজ শালবন দেখা যাচ্ছে। কখনো একটা মস্তবড় ফ্ল্যাটবাড়ির কথা ভাবি, তার ষোলতলার বাইরের ঘরে জানালাটা লাগানো, তার মধ্যে দিয়ে আমাদের এই জন্মদুঃখী শহরটা কেমন ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মতো দেখায়।

pathagar.net

যুদ্ধের গল্প

গাঁয়ের বাড়ির পাশে একটা এজমালি মানে ভাগের পুকুরে আমাদের এক আনা দু'-আনা অংশ ছিল। আমরা সারা বছর গাঁয়ে থাকতাম না। পুজো-পার্বণে, ফসল কাটার সময় কেউ-কেউ যেত, বাকি বছরটা কাছেই কয়েক মাইল দূরে শহরে আমাদের বাসাবাড়িতে, ইস্কুল-কাছারি সব সেখানে, আমরা সেখানেই থাকতাম।

গাঁয়ে বসবাস করা হত না বলে দেখাশোনার অভাবে এজমালি পুকুরের আমাদের অংশটা জ্যাঠামশায় ইজারা দিয়েছিলেন পাট কোম্পানির দারোয়ান সুরজলালকে।

দ্বারভাঙ্গা নিবাসী সুরজলালের পিতামহ অনেকদিন আগে কী করে মধ্যবাংলার ঐ গহন প্রদেশে এসে পৌঁছেছিল নিতান্ত জীবিকার টানে। তারপর তারা ওখানেই শিকড় গেড়ে বসে যায়। এক রকম দেহাতি টানে পূর্ববঙ্গীয় বাংলায় কথা বলত সুরজলালেরা। আচারে-আচরণে প্রায় বাঙালিই হয়ে গিয়েছিল, শুধু মাছ খাওয়া ছাড়া।

সুরজলালের মা-ঠাকুমাকে আমরা গাঁয়ের বাড়িতে দেখেছি। সুরজলালের মা কিংবা ঠাকুমা, আমরা মাছ খাই বলে কখনও আমাদের বাড়িতে খেত না। জলতেষ্টা পেলেও গেলাসে জল খেত না। মাছের ছোঁয়া আছে বলে হাতের আঁজলা ভরে জল খেত। সুরজলাল ছিল ব্যতিক্রম। বাধ্য হয়েই ব্যতিক্রম। বিপত্নীক সুরজলাল প্রৌঢ় বয়েসে মাছ খাওয়া আরম্ভ করেছিল। মাঝিবাড়ির এক সোমত্ত বিধবা বৌ পাট কোম্পানির অফিসঘর ঝাঁট দিত, বাবুদের খাওয়ার জল তুলে দিত ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ইঁদারা থেকে। কালক্রমে সে সুরজলালের রান্নাবান্না, দেখাশোনা এবং অবশেষে তার সঙ্গে দারোয়ানের ঘরে বসবাস শুরু করে।

পশ্চিমা পাড়ায় সুরজলালের স্বজাতিরা থাকত এবং মাঝিপাড়ায় এ নিয়ে ঢিঢি পড়ে যায়, কিন্তু গ্রামের সমাজ ধীরে ধীরে ব্যাপারটা মেনে নিয়েছিল। তখন এরকম আকছার, এদিক-ওদিক চাপা কথাবার্তা, নিন্দেমন্দ হত, তারপর যথানিয়মে একদিন গুঞ্জন থেমে যেত।

ঐ মাঝি বৌ মণিবালার সাহচর্যে সুরজলাল মাছ খাওয়া ধরে। চরিত্রস্খলন হলেও লোকটি মোটামুটি বিশ্বাসী ছিল। আমাদের গাঁয়ের বাড়ির পুকুরের অংশ ছাড়াও আরও অনেক কিছুর দেখাশোনার ভার সুরজলালের ওপর দেওয়া ছিল। আমরা যদি কখনও গ্রামে যেতাম, কয়েকদিন আগে সুরজলালকে ঘরের চাবি পাঠিয়ে দেওয়া হত। সুরজলাল ঘর খুলে ঝেড়েমুছে আমাদের যাওয়ার জন্য ঠিকঠাক করে রাখত। উনিশশো পঞ্চাশ সালে কী সব জিনিসপত্তর কেনা-কাটা করতে গিয়ে ঢাকা শহরে সুরজলাল দাঙ্গায় খুন হয়েছিল। তবে সে অন্য এক খারাপ গল্প। আমাদের এই যুদ্ধের গল্প এর আট বছর আগের।

উনিশশো বেয়াল্লিশ সালের শীতকাল বোধহয় সেটা। মন্বন্তরের আগের বছর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে পুরোদমে। জাপানীরা কলকাতা, চাটগাঁয়ে বোমা ফেলে গেছে। চারদিকে সাজ সাজ হইহই রব। সবাই যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করে। কেউ কেউ বলে, জাপানীরা এই এল বলে, ইংরেজ রাজের দিন শেষ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বোমারু বিমান গণ্ড মফঃস্বলের আকাশের অনেক উঁচু দিয়ে চলে যায়। লোকে ঘাড় কাত করে দিগন্তে বিন্দু হয়ে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সেই বিমানগুলোকে ভয়ে ও বিস্ময়ে দেখে যায়।

তখনও বড় ইস্কুলে যাইনি। পাড়ায় পাঠশালার নিচু ক্লাসের ছাত্র আমি, দাদা এক ক্লাস

ওপরে। পাঠশালাতেও যুদ্ধের কথা হয়। লোকে কলকাতা থেকে পালিয়ে মফঃস্বলে আসা আরম্ভ করেছে জাপানী বোমার আতঙ্কে। কামরা-ভর্তি ভীত, সন্ত্রস্ত মানুষ নিয়ে শেয়ালদা থেকে ট্রেন এসে পৌঁছচ্ছে সিরাজগঞ্জে, গোয়ালন্দে। সেখান থেকে নৌকোয়, স্টিমারে, লঞ্চে অথবা সম্ভব হলে ঘোড়ার গাড়ি করে লোকজন চলে যাচ্ছে নিজেদের গাঁয়ের পুরনো ভিটেয়। তখনও ভিটেমাটি মানুষের ছিল, বিপদে দাঁড়ানোর জায়গা ছিল।

পাঠশালায় দৈনিক দু'চারটে নতুন মুখ দেখা যেত। কলকাতা থেকে পলাতক পরিবারের শিশু। তাদের জামাকাপড়, কথাবার্তা, আচরণ সব আলাদা, আমরা রীতিমতো সমীহ করতাম তাদের। তারা অত্যন্ত গর্বিতভাবে কলকাতার জাপানী বোমার গল্প আমাদের বলত।

আমাদের পাঠশালার হেডমাস্টার ছিলেন প্রশান্ত দাশগুপ্ত। খুব কড়া ও খটমটে প্রকৃতির মানুষ। একদিন যুদ্ধের গল্প বলেছে বলে আনকোরা নতুন একটা ছেলেকে কান ধরে সারা দুপুর বেঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখলেন। আগে এরকম উনি অনেক করেছেন, এবারে এর পরিণাম হয়েছিল ভয়াবহ। সেই পরিণতিতে পৌঁছানোর পূর্বে সুরজলালের সামান্য বৃত্তান্তটি সেরে নিই। কারণ সেখানেই এই ক্ষুদ্র কাহিনীর রহস্য নিহিত রয়েছে।

শীতকালের সকাল। আমাদের দালানের সবচেয়ে দক্ষিণ দিকের ঘরে লেপ মুড়ি দিয়ে আমি আর দাদা তক্তাপোষে শুয়ে আছি। বেলা বেশি হয়নি, তবে বন্ধ জানালার ফাঁকফোকর দিয়ে সূর্যের আলোর রেখা ঘরে ঢুকছে আর সেই সঙ্গে একটা আঁশটে গন্ধ। এই আঁশটে গন্ধটা আমাদের চেনা। এর মানে হল, সুরজলাল আর মণিবালা মাছ নিয়ে এসেছে গাঁয়ের বাড়ি থেকে, সঙ্গে অবশ্যই তরিতরকারি বা ফলমূল যা কিছু হয়েছে আমাদের জমিতে, তার ভাগ।

মাছ-তরকারি জিনিসপত্র নিয়ে সূর্য ওঠার আগেই সুরজলাল আর মণিবালা রওনা হয় গাঁ থেকে, তার আগে মাছ ধরা শুরু হয়ে থাকে শেষরাতে। তরকারি তুলে রাখা হয় আগের দিন।

রোদ উঠতে উঠতে ওরা দুজনে পৌঁছে যায় শহরে। বাড়িতে এসে কাউকে ডাকে না, ডাকতে হয় না। আমাদের শোয়ার ঘরের সামনের বারান্দায় এসে বসে। যেভাবেই হোক, সবাই টের পেয়ে যায় ওরা এসেছে। সবাই একবার করে এসে দেখে যায় কী মাছ, কী তরকারি এল। একটু পরে মা এসে সুরজলালকে বলে, "মাছ-টাছগুলো রান্নাঘরে নামিয়ে দিয়ে এস।" মা মণিবালাকে রান্নাঘরে ঢুকতে দিতো না সে দুশ্চরিত্রা বলে।

সে যা হোক, সেদিন সকালে মাছের আঁশটে গন্ধ পাওয়া মাত্র আমি আর দাদা দুজনে লেপের মোহ কাটিয়ে বারান্দায় গেলাম সুরজলাল কী মাছ এনেছে সেটা দেখতে। প্রচুর বেগুন, ফুলকপি, সাদা একটা বিরাট মিষ্টি কুমড়ো আর বেশ মাঝারি আয়তনের দুটো কাতলা মাছ। দীর্ঘপথ এত ভারি জিনিস বহন করে এনে এই শীতের সকালেও সুরজলাল এবং মণিবালা তখনও দরদর করে ঘামছে। বারান্দায় বসে হাঁপাচ্ছে।

সুরজলালের সঙ্গে আমার এবং দাদার দুজনেরই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। তার সঙ্গে নানা বিষয়ে আমাদের কথাবার্তা, আলোচনা হত। তার বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিষয়ে আমার এবং দাদার যথেষ্ট উচ্চ ধারণা ছিল।

নদীতে সাঁতরানোর সময় কুমীর হঠাৎ পা কামড়ে ধরলে কী করতে হবে কিংবা কোনও পানাপুকুরে অনেকগুলো বড় কালো হাঁড়ি ভাসতে দেখলে বুঝে নিতে হবে যে, ঐ হাঁড়ি-

গুলোর মধ্যে মাথা লুকিয়ে ডাকাতেরা রয়েছে, রাত হতেই পাশের গৃহস্থবাড়িতে ডাকাত দল চড়াও হবে। দ্বারভাঙ্গাই যে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শহর (ঢাকা-কলকাতার চেয়েও বড়), তাদের দ্বারভাঙ্গার মহারাজাই যে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি, এসব জ্ঞান ঐ শিশু বয়েসেই আমরা সুরজলালের কাছ থেকে পেয়েছিলাম।

এবার দেখলাম, সুরজলাল যুদ্ধ নিয়ে খুব ভাবিত। তার একটা বড় কারণ ছিল তার পাট কোম্পানির দারোয়ানি চাকরি। পাট কোম্পানির সাহেবেরা যুদ্ধের দামামা বাজতেই সৈন্যদলে নাম লিখিয়ে লড়াই করতে ফ্রন্টে চলে গেল। খুব বুড়ো বা অথর্ব দু'চারজন রয়ে গেছে ব্যবসা দেখার জন্যে। তারা রেডিয়োতে রাতদিন খবর শোনে আর আলোচনা করে, শুনে শুনে সুরজলালও যুদ্ধের চিন্তায় জড়িয়ে পড়েছে।

কলকাতায় যে বোমায় লাখখানেক লোক মারা গেছে, 'গরমেন্ট' সব গোপন করেছে, বৈদ্যরা যে বার্মা দখল করে নিয়েছে, বৈদ্যরা চট্টগ্রাম আক্রমণ করে সমুদ্রের সঙ্গে মিশিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে, বৈদ্যরা যে আর কয়েকদিনের মধ্যেই ঢাকা-কলকাতা, সিরাজগঞ্জ-ময়মনসিংহ, এমন কি আমাদের গ্রাম-গঞ্জ সব আক্রমণ করবে—সুরজলালের মুখে এসব কথা শুনে সেই সাতসকালে আমাদের বুক ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল। আমাদের গায়ের লোম সমস্ত খাড়া হয়ে উঠল।

কিন্তু 'বৈদ্য' ব্যাপারটা আমরা ঠিক ধরতে পারলাম না। সুরজলালকে বললাম, "কিন্তু সুরজদা, সবাই যে বলছে জাপানিরা বোমা ফেলছে, জাপানিরা আক্রমণ করছে, তুমি বৈদ্য বলছ কেন? বৈদ্য মানে কী?"

খুব গম্ভীরভাবে তখন সুরজলাল সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, "জাপানিরা বৈদ্য।"

এতদিন পরে এখন বুঝি, সুরজলাল আসলে বৈদ্য বলতে 'বৌদ্ধ' বোঝাতে চেয়েছিল। পাটের সাহেবদের আলোচনায় সে জানতে পেরেছিল যে জাপানিরা বৌদ্ধ এবং সেই জ্ঞানটা আমাদের চালান করেছিল।

এই জ্ঞান আমার আর দাদার পক্ষে ভয়াবহ হয়ে উঠল। বৈদ্য কথাটা আমাদের জানা, যদিও পুরো ধারণা নেই, কিন্তু সুরজলাল যে বলল, বৈদ্যরা জাপানি কিংবা জাপানিরা বৈদ্য, এ কথার মানে কী?

একটু পরে ঠাকুরঘরের দাওয়ায় রোদ্দুরে বসে নারকেলনাড়ু দিয়ে মুড়ি চিবোতে চিবোতে দাদা ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কর্তামা, বৈদ্য কারা?'

আমরা ঠাকুমাকে কর্তামা বলতাম। কর্তামা মালা জপ করছিলেন তখন, তবে সব সময়েই কর্তামা চোখ আর কান খোলা রাখতেন। সব কথা শুনতেন, প্রয়োজনে জবাব দিতেন। সব কিছু দেখতেন, প্রয়োজনে মন্তব্য করতেন। দাদা ছিল কর্তামার প্রিয়তম নাতি। দাদার প্রশ্ন শুনে কর্তামা জপ-মালার আবর্তন থামিয়ে বললেন, "আমরা যেমন বামুন, বৈদ্যরা তেমনি বৈদ্য, সুরজলালরা হিন্দুস্থানী, মণিবালারা মাঝি, রফিকরা মুসলমান। তারপর জপমালা এক রাউন্ড ঘুরিয়ে আবার বললেন, "তোতনরা ব্রাহ্ম, নলিনী বৌদিরা কায়েত।"

দাদা এত বিস্তৃত বিবরণ চায়নি, দাদা তাই বলল, "সে তো বুঝলাম, কিন্তু কর্তামা বৈদ্য কারা?"

কর্তামা জপমালা থামিয়ে বললে, "সেনগুপ্ত, দাশগুপ্ত এরা সব বৈদ্য। আমাদের পাশের বাড়ির ঐ নন্তুরা সেনগুপ্ত, থানার ছোট দারোগা কানাই সেনগুপ্ত এরা হল বৈদ্য।'

pathagar.net

আমি আর দাদা দুজনেই উদ্‌গ্রীব হয়ে সব শুনছিলাম। দাদা ঝট্‌ করে প্রশ্ন করল, 'দাশগুপ্ত? আমাদের পাঠশালার হেড স্যার প্রশান্ত দাশগুপ্ত?'

কর্তামা দ্বিধা না করে বললেন, 'হ্যাঁ, প্রশান্তরাও বৈদ্য।' তারপর দ্রুত জপমালা চালাতে চালাতে বললেন, 'কে বৈদ্য, কে বামুন এসব দিয়ে কী হবে? যাও, আর বিরক্ত কোরো না।'

আমরা চলে এলাম বটে, কিন্তু তখন আমাদের মাথায় ঘুরছে, বৈদ্যরা জাপানি, জাপানিরা বৈদ্য, জাপানিরা বোমা ফেলছে, আক্রমণ করছে, হেডস্যার দাশগুপ্ত, দাশগুপ্ত বৈদ্য, বৈদ্যরা জাপানি।

সেইদিন পাঠশালায় গিয়ে আমরা দূর থেকে হেডসারকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্টাডি করলাম। পুরো শত্রুর মতো চেহারা, শত্রুর মতো হাবভাব, আচার আচরণ। আমি আর দাদা বিস্তর গবেষণা করলাম, মাথা ঘামালাম। তারপর স্থির নিশ্চিন্ত হলাম যে—বার্মা দখলে, চট্টগ্রাম আক্রমণে, কলকাতায় বোমা ফেলায় হেডস্যার প্রশান্ত দাশগুপ্তের হাত আছে।

কলকাতা থেকে আগত নতুন সহপাঠীদের সঙ্গে এ বিষয়ে খুব ফিসফিস করে আলোচনা করলাম। তাদের মধ্যে একজন, যাকে যুদ্ধের গল্প বলার জন্য প্রশান্ত স্যার কানে ধরে বেঞ্চির ওপরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন, সে গম্ভীর হয়ে বলল যে, সে প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিল প্রশান্তবাবু জাপানিদের স্পাই। খিদিরপুর ডকে যেদিন বোমা পড়ে, সে প্রশান্তবাবুকে কলকাতায় হাতিবাগান বাজারে দেখেছিল।

রেডিয়োতে, খবরের কাগজে স্পাই, গুপ্তচর ও পঞ্চম বাহিনীর বিরুদ্ধে তখন জোর প্রচার চালাচ্ছে মিত্রশক্তির তরফে ভারত সরকার। প্রশান্তবাবু যে জাপানিদের স্পাই, এ কথাটা রটতে ঘণ্টা আটেক লেগেছিল। পাঠশালা থেকে ছাত্রদের বাড়ি ঘুরে বড় রাস্তা, রেস্টুরেন্ট, বটতলা, নদীর ঘাট হয়ে অফিস-আদালত হয়ে খবরটা যথাসময়ে থানায় পৌঁছেছিল।

সেদিনই গভীর রাত্রে ভারত রক্ষা আইনে পুলিস হেডস্যার দাশগুপ্তকে গ্রেপ্তার করে। পরদিন সারা শহর তোলপাড়—ঐ রকম মিটমিটে প্রশান্ত মাস্টার, তার পেটে পেটে এত, সে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, জাপানিদের ঘুঘু স্পাই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আর মুঘন্তরের ডামাডোলে কত ঘটনা চাপা পড়ে গেছে। প্রশান্তবাবু কবে কীভাবে মুক্তি পেয়েছিলেন, তা আমার মনে নেই। যাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে পারতাম, তারা হাতের কাছে নেই কিংবা বলা উচিত ইহজগতে নেই।

সুতরাং এ গল্পটা এখানেই ধামাচাপা দিতে হচ্ছে। তবে কোথাও কোনও যুদ্ধ হচ্ছে এরকম খবর চোখে পড়লে কিংবা কোনও গুপ্তচর ধরা পড়েছে শুনলে এখনও আমার প্রশান্ত-স্যারের ঘটনাটা আবছা আবছা মনে পড়ে।

বভ্রুবাহন কয়েকটি গাধার গল্প

বেশ কয়েক বছর পরে দেশের বাড়িতে এসেছি। পাসপোর্ট, ভিসা, কাস্টমস, প্লেন, বাস কলকাতা থেকে অনেকটা পথ। সেই সাতসকালে কলকাতার বাড়ি থেকে রওনা হয়ে সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় এখানে এসে পৌঁছেছি।

এখানে মানে এই পুরনো ভাঙা বাড়িতে, যে বাড়িতে আমি জন্মেছি, বড় হয়েছি। এখন যে খাটে শুয়ে আছি, সেই খাটেই জীবনের প্রথম পনেরো বছর ঘুমিয়েছি।

আমাদের ছোটবেলায় রেলে, স্টিমারে, তারপর ঘোড়ার গাড়িতে কলকাতা থেকে এখানে আসতে অন্তত দেড় দিন লাগত। এখন সকাল থেকে সন্ধ্যে, দশ-বারো ঘণ্টাতেই চলে আসা যায়। তবে ক্লান্ত লাগে, তখন রেল-স্টিমার যাত্রায় অত ক্লান্তি ছিল না। কিংবা বয়েসটা কম ছিল, তাই।

এসে ছোটভাই এবং বাড়ির অন্যদের সঙ্গে একটু কথা বলে, চারটি ডালভাত মাছের ঝোল খেয়ে ভর সন্ধ্যেয় শুয়ে পড়েছি। না শুয়ে গত্যন্তর ছিল না, চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, এখানেও লোডশেডিং, এরা বলে পাওয়ার কাট (এদের কথাটাই ঠিক)। কোথাও না বেরিয়ে আজ রাতটা বিশ্রাম নেব ঠিক করে মশারির নীচে চলে এসেছি, মশাও খুব, মশারির বাইরে তাদের তীব্র গর্জন শোনা যাচ্ছে। আমি অবশ্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছি।

একটা পরিচিত শব্দে অনেক রাতে ঘুম ভাঙল। রাত তখন অন্তত একটা-দুটো হবে।

খুট-খুট্, খুট-খুট্—একটা খুরওয়ালা চতুষ্পদ জন্তু ছাদের ওপরে হেঁটে বেড়ালে যে রকম শব্দ হয়, ঠিক সেই শব্দ।

ঘুমের আচ্ছন্ন ভাব কেটে যেতে খেয়াল হল ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু ছাদের ওপরে খুটখুট শব্দের সঙ্গে এক লহমায় ফিরে এল চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর আগের স্মৃতি। বভ্রুবাহনের কথা মনে পড়ল।

বভ্রুবাহন ছিল আমাদের ছোট শহরের ধোপাপট্টির গিয়াস রাজার গাধা। রজক থেকে রাজা, রাজা উপাধিটা শহরের লোকের দেওয়া, গিয়াস রাজার আসল নাম ছিল গিয়াস মিঞা কিংবা অনুরূপ অন্য কিছু। আমরা অবশ্য বলতাম, গিয়াস খালা মানে গিয়াসমেসো। গিয়াসমেসোর স্ত্রী রাজিয়ামাসি ছিল আমাদের মামার বাড়ির গ্রামের মেয়ে। পাঠশালায় নিচু ক্লাসে আমার ছোট মাসিমার সঙ্গে পড়েছে, সেই সূত্রে মাকে বলত দিদি, আর আমরা তার স্বামীকে বলতাম গিয়াসখালা। রাজিয়ামাসি ছিল একেবারে আমাদের ঘরের লোক।

ছোট নদীর ধারে আমাদের ছোট শহর। কিন্তু খুব কাছেই ধলেশ্বরী আর যমুনা নদীর বাঁক। দু'-এক বছর অন্তরই বন্যা হত চারপাশে, কোনও কোনও বছর বন্যার ঘোলা জলে আমাদের শহরও ডুবে যেত। স্কুলবাড়ি, কাছারি বাজার, বাড়িঘর সব জলে জলে জলাকার। সেটা ছিল আমাদের ছোটদের ফুর্তির সময়। জলের মধ্যে আমরা ঝাঁপিয়ে ছুটতাম। জলের দেশ বলে প্রায় জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সব শিশু সাঁতার শিখে ফেলত, ফলে ডুবে মরার ভয় ছিল না।

এ ছাড়া আমরা কলাগাছ কেটে ভেলা বানিয়ে কিংবা সম্ভব হলে ডিঙি নৌকো সংগ্রহ

করে নৌকো বাইচ খেলতাম। মাছ ধরার চেষ্টা করতাম গামছা দিয়ে জাল বানিয়ে কিংবা ছিপ দিয়ে। স্কুলটুল ছুটি থাকত বন্যার জন্যে। তবে বাবা-কাকারা নৌকো করে অফিস-কাছারিতে যেতেন। সঙ্গতিপন্ন মক্কেলরা আমাদের উকিলবাড়ির বাইরের উঠোনে বড় ঢাকাই নৌকোয় করে এসে জামগাছে নৌকো বাঁধতেন।

বন্যার সময় গিয়াসখালার খুব অসুবিধে হত। একটু নিচু জমিতে তার ঘর ছিল। অল্প জলেই সেটা ডুবে যেত। জামাকাপড় শুকোতে দেওয়া যেত না, গাধাটাকে রাখার জায়গা ছিল না, তখন বাড়ির লোকজন, গাধা টাধা সুদ্ধ গিয়াসখালা ইস্কুলবাড়ির বাঁধানো বারান্দায় সাময়িক আস্তানা পাতত। কেউ কোনোদিন আপত্তি করেনি।

কিন্তু একবার এমন বন্যা হল যে, ইস্কুল বাড়ির বারান্দাতেও জল উঠল। গিয়াসখালা আমাদের বাড়িতে এসে আমাদের ঠাকুর্দাকে ধরল, "বর্ষার এই কয়টা দিন যদি আপনাদের ছাদটায় থাকতে দেন।"

ঠাকুর্দা রাজি হয়ে গেলেন, শুধু বললেন, "জল কমলেই কিন্তু নেমে যাবে।"

এর পরেই একটা বিপত্তি বাধল। একটু পরে গিয়াসখালা যখন রাজিয়ামাসি, ছেলে-মেয়ে, হাঁড়ি-কুড়ি, গাধা সব কিছু নিয়ে ছাদে উঠতে এসেছে, আমার কাকা বাধা দিলেন, ঠাকুর্দাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা, তুমি কি গিয়াসকে বভ্রুবাহনকে নিয়ে ছাদে ওঠার অনুমতি দিয়েছ?"

ঠাকুর্দা কাছারিঘরে মক্কেলদের কাগজপত্র দেখছিলেন, তিনি চোখ থেকে চশমা নামিয়ে কাকাকে প্রশ্ন করলেন, 'বভ্রুবাহন? বভ্রুবাহন কে?'

ঠাকুর্দা 'বভ্রুবাহন' নামটা জানতেন না, গিয়াসখালাও জানত না, বভ্রুবাহন নিজেও নয়।

আসলে বভ্রুবাহন নামটা কাকারই দেওয়া। কাকা আমাদের বলেছিলেন, 'বভ্রু মানে হল ময়লা কাপড়। ময়লা কাপড় যে বহন করে, সমাস অনুযায়ী সে হল বভ্রুবাহন। তাই গিয়াসের গাধাটার আমরা নাম দিয়েছি বভ্রুবাহন।

আমার সেজপিসি সে বছর সংস্কৃতে লেটার নিয়ে ম্যাট্রিক পাস করেছেন। সেজপিসি কাকার এই কথায় ঘোরতর আপত্তি তুললেন, বললেন, 'সম্পূর্ণ বাজে কথা, বভ্রু মানে ময়লা কাপড় কিছুতেই নয়, আর বাহন মানে বহন করা নয়, বাহন হল যেমন দুর্গার বাহন সিংহ, সরস্বতীর হাঁস। আর গাধা হল শীতলার বাহন। তা ছাড়া এটা একটা মেয়ে গাধা, বভ্রুবাহন না হয়ে ওর নাম হওয়া উচিত বভ্রুবাহিনী।' সে যাই হোক, আমরা পরে জেনেছিলাম যে, কাকা যে গাধার নাম বভ্রুবাহন দিয়েছিল, সে লিঙ্গ বিবেচনা করে বা অর্থ ধরে নয়, এমনি সরলভাবেও নয়। মাসখানেক আগে আদালতের রাস্তায় পিকেটিং করার সময় কাকাকে পুলিশ ধরে এবং বিচারে কাকার এক সপ্তাহ জেল হয়। সেই মামলার বিচারকের নাম নাকি ছিল বি বি চ্যাটার্জি। কাকা খোঁজ নিয়ে বের করেছে বি বি হল বভ্রুবাহন। এবং রাগ মেটাতেই গাধার নাম হল বভ্রুবাহন।

ঠাকুর্দা অবশ্য বভ্রুবাহনের ছাদে থাকায় কোনো আপত্তি করেননি। আর এই জলে নিরীহ গাধাটাই বা যাবে কোথায়?

বরং ছাদে উঠতে বভ্রুবাহন আপত্তি করেছিল। সে কিছুতেই সিঁড়ি বেয়ে উঠবে না। গিয়াসখালাও ছাড়বে না। তিন সিঁড়ি ওঠে, দুই সিঁড়ি নেমে আসে। প্রায় ঘণ্টা-দুয়েক পরিশ্রম আর ঠেলাঠেলি করে বভ্রুবাহনকে ছাদে তোলা গিয়েছিল।

যথারীতি কয়েক দিন পরে জল নেমে গেল। বভ্রুবাহন-সহ রাজিয়ামাসিরাও গিয়াসখালার সঙ্গে পুরনো ডেরায় ফিরে গেল। কিন্তু কী কারণে যেন আমাদের ছাদটা বভ্রুবাহনের পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। ছাদের সিঁড়িটা ছিল দালানের বাইরের দিক দিয়ে, আগেকার দিনের বাড়িতে যেমন হত। বভ্রুবাহন সুযোগ পেলেই কিংবা গিয়াসখালার সঙ্গে বোঁচকা নিয়ে আমাদের বাড়িতে এলেই খট-খট করে ছাদে উঠে যেত। শেষের দিকে এমন হয়ে গিয়েছিল, রাতের দিকে সঙ্গী সাথী জুটিয়ে ধোপাপট্টি ছেড়ে আমাদের ছাদে উঠতে আসত। গাধার খুরের খুটখুট শব্দে আমাদের ঘুম ভেঙে যেত। অনেক সময় আমরা অত রাতে ছাদে লাঠি দিয়ে তাড়া করে বভ্রুবাহন এবং তার সঙ্গীদের নামিয়ে দিতাম।

এ সব অনেকদিন আগেকার কথা। সে বছর বন্যায় আমাদের দুজন নতুন বন্ধু হয়েছিল, রাজিয়ামাসি আর বভ্রুবাহন। গাধা যে অত চালাক হয়, সেই প্রথম জেনেছিলাম। আর রাজিয়ামাসি? ইস্কুল থেকে আমি আর দাদা একমাথা উকুন নিয়ে এসেছিলাম, পুরো বর্ষাকালটা তার দুই হাঁটুর মধ্যে আমাদের মাথা চেপে ধরে রাজিয়ামাসি সব উকুন মেরে দিয়েছিল।

আজ এতকাল পরে বাড়ি ফিরে মধ্যরাতে বিছানায় শুয়ে মাথার ওপরে ছাদে চতুষ্পদ জন্তুর পায়ের খুরের খুটখুট শব্দ শুনে অনেক পুরনো কথা মনে পড়ল। রাজিয়ামাসির কথা, বভ্রুবাহনের কথা, আরও কত উল্টোপাল্টা কথা। একটা খটকাও লাগল। সে তো কতকালের কথা, সেই বভ্রুবাহন কি এখনো বেঁচে আছে? একটা গাধার পরমায়ু কতদিন? যুদ্ধ, পার্টিশন, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, মহামারীতে কত লক্ষকোটি লোক মরে গেল, গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, আর সামান্য একটা ধোপার ভারবাহী গাধা, সে এখনো খুটখুট করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পরদিন সকালে ছোটভাইকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, শহরে ধোপাপট্টি কয়েক বছর হল উঠে গেছে, সেখানে এখন নিউমার্কেট হয়েছে। রাজিয়ামাসি, গিয়াসখালাদের খবরও কেউ রাখে না। নিউমার্কেট তৈরির সময় কে কোথায় ছিটকিয়ে গেছে, সেও অনেক দিন আগের কথা। ছোটভাই খুব ভালো জানে না, তবু বলল, শুধু এই একটা বুড়ো গাধা আছে। দিনে ইস্কুলের মাঠে চরে বেড়ায়, রাতে আমাদের ছাদে এসে ওঠে। দু'-একবার আটকানোর চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সম্ভব হয়নি। রাতের অন্ধকারে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে যায়।

সেই দিন রাতে একটা টর্চ নিয়ে ছাদে উঠে গাধাটাকে দেখলাম। বভ্রুবাহনের একটা কান ছেঁড়া ছিল মধ্য দিয়ে। এটার দুটো কানই ঠিক আছে। বুঝতে পারলাম বভ্রুবাহন নয়, বভ্রুবাহন কিংবা তার সঙ্গীসাথীদের কোন বংশধর হবে। চমৎকার চরে বেড়াচ্ছে আমাদের পুরনো বাড়ির ছাদে।

পরের দিন বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে ইস্কুলের মাঠে গিয়ে গাধাটাকে দেখলাম, মাঠের একপাশে বিরস মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রীতিমতো বুড়ো হয়েছে, আমি সামনে যেতে একটু চমকিয়ে ডাইনে বাঁয়ে তাকালো, বুঝতে পারলাম ভালো দেখতে পাচ্ছে না, চোখে হয়তো ছানি পড়েছে।

ইস্কুলের মাঠ থেকে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত যেতে বড় রাস্তা পড়ে, সেই রাস্তা দিয়ে দ্রুতগামী ট্রাক, দূরপাল্লার বাস যায়। তা ছাড়া একালের অন্য সব শহরের মতই এ শহরেরও রাস্তায়-ঘাটে অলিগলিতে বিপজ্জনক গতিতে কিলবিল করছে রিক্শা।

মনের মধ্যে আবার আর একটা খটকা লাগলো। এই বুড়ো প্রায়-কানা গাধাটা কী করে এই সব রাস্তা পার হয়ে রাতের বেলায় আমাদের বাড়িতে যায়, ছাদে ওঠে?

ইস্কুলের চৌকিদারের খোঁজ করলাম। অনেককাল আগে আমাদের সময়ে যে চৌকিদার ছিল, সে খুব সম্ভব আমার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে কিছুদিন পড়েছিল। এর নাম তাহেরউদ্দিন।

তাহের যা বলল, তাতে একটু গোলমাল লাগল। সে বলল, গাধাটা দিনরাতই ইস্কুলের মাঠে কিংবা বারান্দায় থাকে, অনেক দিন হল এটা একা-একাই এসে জুটেছে। চোখেও ভালো করে দেখে না, ইস্কুল ছেড়ে কোথাও যায় না, যাওয়ার ক্ষমতাও নেই।

সামান্য ব্যাপার, কিন্তু মনের মধ্যে একটু সমস্যা বেধে গেল। সেদিন রাতেই খাওয়া-দাওয়ার পরে ঘুমোতে যাওয়ার আগে টর্চলাইটটা নিয়ে ইস্কুলের মাঠে গেলাম। গিয়ে প্রথমে গাধাটাকে কোথাও দেখতে পেলাম না, ভাবলাম বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখতে হবে ছাদে উঠে গিয়েছে কি না।

কিন্তু তা নয়, কারণ ইস্কুলের মাঠ থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে দেখি, দেয়ালের একপ্রান্তে এক পুরনো যজ্ঞডুমুর গাছের নীচে চোখ বুজে গাধাটা ঝিমোচ্ছে। টর্চের আলোয় এবার গাধাটাকে ভালো করে দেখলাম, না, এটারও কান ছেঁড়া নয়, মানে বভ্রুবাহন নয়, তবে খুব বুড়ো একটা গাধা। কাল রাতে আমাদের বাড়ির ছাদে যেটাকে দেখেছিলাম, সেটা বোধহয় এত বুড়ো ছিল না। তার মানে এ দুটো আলাদা গাধা।

যা হোক বাড়ি ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম।

অনেক রাতে ছাদের ওপর আবার সেই খুটখুট শব্দে ঘুম ভাঙল। কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকার পর ভাবলাম যাই, একটু ছাদে গিয়ে গাধাটাকে আরেকবার দেখে আসি। টর্চ হাতে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

কৃষ্ণপক্ষের মাঝামাঝি তিথি হবে, চৈত্র মাসের শেষ। আমাদের এ-অঞ্চলে এ-সময় এখনও রাতের দিকে একটু হিম-হিম ভাব থাকে। অনেক দিনের পুরনো পাটনাই আমগাছের বোল উঠোনে পড়ে আছে, ঠাণ্ডা বাতাসে মৃদু সৌরভ পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের দালানের পিছনে বুড়ো বকুল গাছটাতে বোধহয় ফল হচ্ছে, বকুলের আর আমের মুকুলের গন্ধে ভরা বহুকাল আগের ঝিরঝিরে সব স্মৃতি, এরই মধ্যে একটা আধলা চাঁদ ছাদের কার্নিশের পাশ বেয়ে উঠল, দূরে একটা পাখি ডাকল, খুব চেনা পাখি নয়, পাখিটার নাম আগে জানতাম, এখন আর কিছুতেই মনে করতে পারলাম না।

ছাদে উঠে গাধাটাকে দেখতে পেলাম। ভালো করে টর্চ দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিশ্চিত হলাম, ইস্কুলের মাঠের গাধা আর এ গাধা এক নয়, এ অনেক তরুণ। এবং বেশ হৃষ্টপুষ্ট, নধরকান্তি। আমার টর্চের আলোয় চমকিয়ে উঠে গাধাটা ছাদের একপাশে সরে গিয়ে দাঁড়াল। আমিও আর বিরক্ত না করে নীচে নেমে এসে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

তবে তখনই মনে মনে ঠিক করলাম, আর মাত্র তিন দিন আছি, এর মধ্যে একদিন খুব ভোরে উঠে সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে থাকব, গাধাটা যখন ছাদ থেকে নেমে আসবে, ওটার পিছে পিছে যাবো, দেখব ও কোথা থেকে আসে।

পরের দিন খুব ভোরবেলা, তখন আকাশের রঙ সবে হালকা হয়ে এসেছে, কাছে দূরে দু'-একটা কাক ডাকছে, আমাদের বাড়ির সামনের পুকুরঘাটে একটা কাদাখোঁচা পাখি উড়ে এসে

বসলো, আমি ছাদের সিঁড়ির নীচে চারদিকে দেখছিলাম, এমন সময় ধীরগতিতে গাধাটা নেমে এলো। কোনাকুনিভাবে আমাদের উঠোনটা পার হয়ে পুকুরের ধার দিয়ে হেঁটে সোজা মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তায় পড়ল। মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তাটা সরাসরি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, গাধাটা নিশ্চিন্ত চিত্তে দক্ষিণমুখী রওনা হল। আমিও একটু পিছন থেকে তাকে অনুসরণ করলাম।

মাইলখানেক বাদে মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা শেষ হয়ে গেছে। তবে তার পরেও অনেকটা রাস্তা খোয়া-বাঁধানো, সেই খোয়া-বাঁধানো রাস্তার একপাশে অশ্বত্থতলায় ছোট ছোট চালাঘর, একটা নলকূপ, একটা তালা লাগানো সাব পোস্টঅফিস, অন্য পাশে জীর্ণ ঘাট নিয়ে আদ্যিকালের এক দিঘি। সবই আমার চেনা, এই অশ্বত্থতলায় আর দিঘির ধার ধরে সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে, মঙ্গলবার আর শুক্রবার। বহুদিনের পুরনো গ্রাম্য হাট। আমাদের শহরের বাজারের শাক-সবজি প্রায় সবই এখান থেকে যায়।

অশ্বত্থতলার একটু আগে রাস্তা থেকে গাধাটা পাশের ধানখেতের আলের ওপর নামলো। মাঠে রবিশস্য কাটা হয়ে গেছে, খোলামেলা ন্যাড়া প্রান্তর। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, সূর্য ওঠার সময় প্রায় হয়ে এলো, এই সময়টাই সবচেয়ে বেশি ঠাণ্ডা লাগে। একটা র‍্যাপার গায়ে জড়িয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম, সেটা দিয়ে ভালো করে কান-মাথা ঢেকে গায়ে জড়িয়ে গাধার পিছনে ধানক্ষেতের আলপথ ধরলাম। আমার চিরদিনের চেনা রাস্তা, ভালোই লাগছিল এই অ্যাডভেঞ্চার, ডাউন মেমোরি লেন।

একটা মাঠে কারা খেঁসারি বুনেছে। খেঁসারির শুঁটি সবচেয়ে মিষ্টি, শুধু এই একটা মাঠেই এখনও ফসল কাটা হয়নি। দানায় টইটম্বুর হয়ে উঠেছে খেঁসারি শস্য। আনমনে বালক বয়েসের মত দু'-একটা শুঁটি ছিঁড়ে দানা ছাড়িয়ে মুখে ফেললাম, অমৃত। কতকাল এমন কিছু খাইনি। আমার সামনের অর্বাচীন গাধাটাও পরমানন্দে আল ধরে যেতে যেতে রবিশস্যের কিঞ্চিৎ আস্বাদ গ্রহণ করছে।

খেঁসারির মাঠ পার হয়ে হাটের পিছনদিকে আমরা যেখানে পৌঁছলাম, সেখানে একটা কামরাঙা গাছের নিচে একটা চালাঘর। সেই চালাঘরের জরাজীর্ণ ঝাঁপে গাধাটা গিয়ে মাথা দিয়ে গুঁতো দিতে লাগলো। ভাগ্যিস গরু কিংবা ছাগলের মতো গাধার শিং থাকে না! যদি থাকত, শুধু সেই ঝাপ নয়, পুরো চালাঘরটাই হুড়মুড় করে পড়ে যেত। আবার হয়তো এ রকম হত না, কারণ একটু পরেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, গাধাটা খুব আলতোভাবে কপাটে ধাক্কা দিচ্ছিল, যেমনভাবে শহরের কলিংবেল বাজিয়ে বলে, "দরজা খুলুন"।

একটু পরে কপাটের ঝাঁপ খুলে গেল। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধা মহিলা, তাঁর হাতে শুকনো বাঁধাকপির ছিন্ন পাতা। গাধাটা প্রায় লাফিয়ে উঠে সেগুলো হাত থেকে মুখে নিয়ে চিবোতে লাগল।

সব কিছু আমার কেমন চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল। এই বাতিল বাঁধাকপির পাতা, এই গাধা, এই মহিলা।

কিন্তু মহিলা আমার চেয়ে অনেক বেশি সপ্রতিভ। তিনি সেই অনার্য যুগের গ্রাম্য রজক-দুহিতা, ইচ্ছাময়ী-নিস্তারিণী প্রাইমারি স্কুলে আমার ছোট মাসির সঙ্গে প্যারিচরণের 'আই মেট এ লেম ম্যান' পড়েছিলেন, খঞ্জ লোকের সঙ্গে দেখা হলে কী ব্যবহার করতে হয় তিনি জানেন, বোঝেন।

রাজিয়ামাসি এক মুহূর্তে আমাকে চিনতে পারল। অন্তত পঁচাত্তর বছর বয়স হয়েছে তার, চোখ-কান সবই ঠিক আছে, নীল আকাশের তলে শুভ্র রৌদ্রে সবুজ মাঠের মধ্যে তার দিন কাটছে, আর চোখ এখনও শালিকের মতো সাবলীল, তার কান কবুতরের মতো প্রখর।

কিছুক্ষণ স্থির ঠাণ্ডা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রাজিয়ামাসি বলল, "খোকন? এতদিন পরে?"

আমি চুপ করে রইলাম। রাজিয়ামাসি বলল, "রেণুদি, জামাইবাবু কেউ নাই। বড় খোকন নাই। তুমি ছাড়া কে আছে? আসো না কেন?"

রেণুদি আমার মা, জামাইবাবু আমার বাবা, বড় খোকন মানে আমার দাদা, সব শেষ, তবু রাজিয়ামাসি আমাকে চিনতে পেরেছে।

প্রাথমিক ভাব-উচ্ছ্বাসের পর রাজিয়ামাসির কাছে যেটুকু জানা গেল, গিয়াসখালা বহুদিন বিগত হয়েছে। ছেলেরা ছন্নছাড়া, মেয়েরাও বিয়ে হয়ে এদিক ওদিক চলে গেছে। এখানে এই হাটখোলায় কুঁড়েঘরে রাজিয়ামাসি একাই থাকে, আর ওই গাধাটা। রাজিয়ামাসি হাটখোলা ঝাঁট দেয়, পরিষ্কার রাখে, যেসব বারে হাট বসে না—লক্ষ রাখে চালা দোকানগুলো যাতে কেউ ভেঙে না নিয়ে যায়। বিনিময়ে হাটবারে দোকানীদের কাছ থেকে আলু, মুলো, চাল যা পারে সংগ্রহ করে। খুব খারাপ নেই সে। এই গাধাটা দিনের বেলায় তার কাছে থাকে, রাতে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত যায় ছাদে থাকবে বলে। আমাদের সেই বভ্রুবাহন, তারই বংশধব বর্তমান গাধাটি। বভ্রুবাহন খুব সম্ভব এর দিদিমা বা দিদিমার মা হবে। বভ্রুবাহনের আরেক নাতি ইস্কুলের মাঠে থাকে, নিউমার্কেট পত্তনের সময় সে ওখানে চলে যায়, শহর ছেড়ে আর আসেনি। তবে এ গাধাটা দৈনিক ফিরে আসে।

আমরা কথা বলছিলাম। গাধাটা একটু দূরে চলে গিয়েছিল, রাজিয়ামাসি তাকে 'আনু-আনু' বলে ডাক দিল। ডাক শুনে আনু-আনু কাছে এসে দাঁত খিঁচিয়ে হর্ষধ্বনি করল। আমি রাজিয়ামাসিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার আনু-আনু আমাদের বাড়ির ছাদ চিনলো কী করে?"

রাজিয়ামাসি বলল, ছোটবেলায় ধোপাপট্টিতে থাকার সময় একদিন ওকে শেয়ালে ধরেছিল। তখন বড় না হওয়া পর্যন্ত কিছুদিন রাতে বাচ্চা আনু-আনুকে শেয়ালের আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্যে আমাদের ছাদে রেখে আসা হত। সেই থেকে ওর এই অভ্যেস। ধোপাপট্টি থেকে হাটখোলায় এসেও আনু-আনুর সে অভ্যাস রয়ে গেছে। জলে ঝড়ে শীতে গরমে সব ঋতুতে সব দিনই সন্ধ্যা লাগতে লাগতে আমাদের ছাদে গিয়ে উঠবে। ওটাই ওর নৈশ বিশ্রাম ও নিদ্রার স্থান।

আগের দিনই ছিল মঙ্গলবার, হাটবার। রাজিয়ামাসির হাতে এখন বড় কাজ, পুরো হাটটা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। আগের দিন হাটের একটা দোকান থেকে রাজিয়ামাসি দুটো বাতাসা পেয়েছিল। আপত্তি টিকল না, বাসিমুখে সেই বাতাসাদুটো মুখে দিয়ে এক গেলাস জল খেতে হল।

দু'দিন পরেই কলকাতায় ফিরে এলাম। এই দু'দিনও আনু-আনু রাতে আমাদের ছাদে এসেছিল। মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে চারপায়ের খুটখুট শব্দ পেয়েছি। যাওয়ার দিন রাজিয়ামাসি এলো, সঙ্গে আনু-আনু। বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

বাসে ওঠার আগে আনু-আনুর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে আমি বললাম, 'কী বভ্রুবাহন! আমাদের বাড়িটা রাতের বেলায় পাহারা দিতে ভুলো না।'

কয়েকদিন আগে কলকাতায় ফিরে এসেছি। কিন্তু নতুন এক উপসর্গ যোগ হয়েছে। অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেলে একটা খুটখুট শব্দ শুনতে পাই, একটা পুরনো দিনের গাধা হাঁটছে।

pathagar.net

বিবি এগারো বারো

এক বি বি ওয়ান ওয়ান ওয়ান টু

সাদাত কলেজ করটিয়ার প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহিম খান সাহেব খুব কড়া অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁরই আমলে সাদাত কলেজ ফার্স্ট গ্রেড কলেজে উন্নীত হয়।

ফার্স্ট গ্রেড কলেজ মানে বি. এ ক্লাস পর্যন্ত। তার আগে সাদাত কলেজে আই. এ. পর্যন্ত পড়ানো হত। তখন কলকাতা ছাড়া সারা বঙ্গপ্রদেশে বি.এ. পর্যন্ত পড়ার কলেজ সামান্য সংখ্যক ছিল, বলা যায় আঙুলে গোনা যেত।

কলেজ ফার্স্ট গ্রেড হওয়ার পর প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহিম খান এম. এ. বি. এল. আরো কড়াকড়ি শুরু করলেন। বি. এ. পরীক্ষার আগে প্রিটেস্টে আর টেস্টে যারা সব বিষয়ে পাশ করেনি তাদের তিনি ফাইনাল পরীক্ষার জন্যে নির্বাচন করতেন না। তাঁর বক্তব্য ছিল, বি.এ. পরীক্ষা ছেলেখেলা নয়, এই পরীক্ষা প্রথম দিয়েছিলেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, এই পরীক্ষা পাশ কবলে গ্র্যাজুয়েট হয়, এই পরীক্ষার মান রক্ষা করতে হবে, যারা পরীক্ষা দিতে বসবে তারা যেন পরীক্ষার যোগ্য হয়।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের এই রকম কড়াকড়ির যুগে মীরের বেতকা গ্রামের বকর ভাই, আবু বকর চৌধুরী পর পর তিনবার বি. এ. পরীক্ষার টেস্টে ডিস্‌অ্যালাউ হলেন।

বকর ভাই আমার কাকার সঙ্গে স্কুলে সহপাঠী ছিলেন। সহপাঠী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কাকা ম্যাট্রিক পাশ করে ঢাকা জগন্নাথ কলেজে পড়তে গিয়েছিলেন। বকর ভাই করটিয়ায় সাদাত কলেজে।

বি.এ. পরীক্ষায় বসতে না পারার দুঃখে বকর ভাই বাড়ি ছাড়লেন, কলকাতায় এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে চলে এলেন ব্যবসা করতে, বিভিন্ন সরকারি অফিসে কি সব টুকটাক জিনিসপত্র সাপ্লাই করতেন। যুদ্ধের বাজারে হঠাৎ বড়লোক হয়ে উঠলেন বকর ভাই, কলকাতায় ক্লাইভ স্ট্রিটে অফিসের আলাদা অফিস করলেন, মীরের বেতকায় গ্রামের বাড়িতে দোতলা পাকা দালান বানালেন, পুকুরের ঘাট বাঁধালেন, আটিয়ার পুরনো মসজিদ একবার নিজের পয়সায় আগাগোড়া চুনকাম করিয়ে দিলেন।

ক্লাইভ স্ট্রিটে যে অফিস করেছিলেন বকর ভাই তার নাম দিয়েছিলেন এ-বি-সি সাপ্লায়ার্স। এ-বি-সি হল আবু বকর চৌধুরীর নামের আদ্যক্ষর সমষ্টি।

ব্যবসা ভালোই চলছিল তার। কিন্তু এর মধ্যে যুদ্ধ শেষ হল, ছেচল্লিশের ষোলই আগস্টের দাঙ্গায় কলকাতা তছনছ হয়ে গেল, স্বাধীনতা এল, দেশ ভাগ হল, আমাদের দিকের দেশটা পাকিস্তান হয়ে গেল, কিন্তু বকর ভাই কলকাতায় রয়ে গেলেন। তাঁর এ-বি-সি সাপ্লায়ার্স তখন আর তেমন চলছে না। তবু অফিসটা ছিল, মাঝেমধ্যে ছুটিছাটায় বাড়ি যেতেন বকর ভাই, বাকি সময় কলকাতাতেই অফিস আগলাতেন। থাকতেন পার্কসার্কাসে, সেখান থেকে ট্রামে ডালহৌসি হয়ে ক্লাইভ স্ট্রিটের অফিস।

ততদিনে আমরাও অনেকেই কলকাতায় চলে এসেছি। বকর ভাই আমার কাকার বন্ধু ছিলেন, গ্রাম সুবাদে তাঁকে আমাদের বকর চাচা বলা উচিত, কিন্তু আর সকলে

বকর ভাই ডাকত বলে আমরাও তাই ডাকতাম। সে যা হোক, বকর ভাই প্রায় নিয়মিতই আমাদের পুরনো কালীঘাটের বাড়িতে আসতেন।

বকর ভাইয়ের ঐ এ-বি-সি সাপ্লায়ার্সের অফিসে একটা ফোন ছিল। তখন ঘরে ঘরে ফোনের এত ছড়াছড়ি ছিল না, একটা পাড়ায় দু-চারটে বাড়ির খোঁজ করলে ফোন দেখা যেত, এমনকি সব অফিসেও ফোন ছিল না।

বকর ভাইয়ের অফিসের ফোন নম্বর ছিল বড়বাজার এক হাজার একশো বারো, সংক্ষেপে ইংরেজিতে বি বি ওয়ান ওয়ান ওয়ান টু (বি বি ১১১২)। তখনও এখনকার মত অটোমেটিক ফোন চালু হয়নি। ফোন তুলে এক্সচেঞ্জে নম্বর চাইতে হত।

ব্যবসাপত্র কলকাতায় ভাল চলছিল না। দিনকালও ভালো নয়। অবশেষে বকর ভাই ঠিক করলেন ব্যবসা-পত্র গুটিয়ে দেশে ফিরে যাবেন।

চলে যাওয়ার আগের দিন আমাদের বাসায় এলেন হাতে একটা ভারী রেশনব্যাগ। অল্পবিস্তর কথাবার্তার পর ব্যাগের ভিতর থেকে বার করলেন একটা টেলিফোনের রিসিভার, কষ্টিপাথরের মতো কালো কুচকুচে সে একটা প্রমাণ সাইজের টেলিফোন যন্ত্র। আজকালকারগুলোর মতো খেলনা জিনিস নয়। রীতিমত ভারী, অন্তত দেড়সের, দুসের ওজন হবে। তার সঙ্গে কয়েক হাত লম্বা তার রয়েছে, সে তারও এক আঙুল মোটা, আজকালের তারের মতো ফিনফিনে নয়।

ফোনটার কথা বলার জায়গায় বেশ চওড়া করে ছড়ানো একটা চোঙার মতো জিনিস রয়েছে। কানে দেওয়ার জায়গাটাও বেশ বড়।

বকর ভাই বললেন, "এ জিনিস আর একালে পাওয়া যাবে না। আসল বেল কোম্পানির সাবেকি জিনিস। অফিসের ফোনটা কাল থেকে কাটিয়ে দিয়েছি কিন্তু কোম্পানি থেকে এসে রিসিভারটা নিয়ে গেল না। এটা আর দেশে নিয়ে গিয়ে কি কাজ হবে। বর্ডারে কাস্টমসেও ধরতে পারে। তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি। যদি কখনও ফিরে আসি, ফেরত নিতেও পারি, না হলে তোমাদেরই থাকবে।"

ফোনটা রেখে বকর ভাই দেশে চলে গেলেন। পরে দেশ থেকে তাঁর একটা সংক্ষিপ্ত পৌঁছ সংবাদ এসেছিল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আর কখনও দেখা হয়নি। বকর ভাই চলে যেতে আমরা ভালো করে ফোনটা দেখলাম। সাদা কাগজ এঁটে কালো ফোনটার গায়ে লাগানো, তাতে লেখা,

ABC Suppliers

BB 1112

সেই থেকে বি বি এক এক এক দুই আমাদের সঙ্গে রয়ে গেল। বি বি মানে বড়বাজার, বড়বাজার এক্সচেঞ্জ, এখন যেমন ফোর ফাইভ বা ডবল টু তখন ছিল বড়বাজার, পার্ক সার্কাস এই রকম এক্সচেঞ্জের নাম ফোন নম্বরে। মাথা গোঁজার তাগিদে এই পোড়া বিদেশী শহরে বাক্স বিছানা ঘাড়ে করে কত যে ঘুরপাক খেলাম! বি বি এক এক এক দুই কিন্তু তদবধি আমাদের সঙ্গে রয়ে গেল।

ফোনের লাইন নেই, কানেকশন নেই শুধু একটা জলজ্যান্ত রিসিভার আমাদের বাড়িতে বাইরের ঘরে এ জিনিস দেখে অনেকে বিস্মিত হত। কেউ কেউ ভুল করে ফোন করতে গিয়ে জব্দও হয়েছে।

pathagar.net

তবে এ জাতীয় ব্যাপার আমাদের বাড়িতে ঘটে থাকে। আমার দাদা একবার রেডিয়োর এরিয়েল জলের দরে পেয়ে কিনে এনেছিল তখন আমাদের কোন রেডিয়ো নেই। বিজন আমার ছোট ভাই, চাঁদনি চক থেকে একটা অ্যান্টেনা কিনে আনল কারণ সেটা তার সামর্থ্যের মধ্যে, আর কিনে আনল এই আশায় যে আমি যদি টিভিটা কিনি, অ্যান্টেনা ব্যবহার করার জন্যেই কিনব। এরও পরে আমার স্ত্রী মিনতি গ্যাসের উনুন কিনেছিলেন গ্যাসের সিলিন্ডার আসার ঢের আগে।

ঘোড়ার আগে লাগাম জোগাড় করে পরে সেই লাগামের জন্যে ঘোড়ার পিছনে আমরা অনেক ছুটেছি। সুতরাং টেলিফোনের রিসিভারটার জন্যে এক সময় একটা কানেকশনের দরখাস্ত আমাদের করতে হল।

ততদিনে বি বি এক এক এক দুই আমাদের সংসারে, দেবত্ব অর্জন করেছে। কষ্টি পাথরের মতো, শালগ্রাম শিলা কিংবা শিবলিঙ্গের মতো কালো কুচকুচে বলেই হোক বা অন্য কারণেই হোক আমার পিসিমা তাঁর অন্যান্য তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর সঙ্গে জুড়ে দেন বি বি এক এক এক দুই। পিসিমা বলতেন বিবি এগারো বারো। তিথিপর্বে সিঁদুর, চন্দনের ফোঁটা পরানো হত, ফুল বেলপাতাও দেয়া হত বিবিকে। শেষের দিকে দেখেছি ছোটো স্টেনলেস স্টিলের থালায় বাতাসা বা নকুলদানাও রাখা হত। পিসিমা বলতেন, "বি বি এগারো বারো খুব জাগ্রত"।

আমরা বলতাম, "এখনও জাগ্রত নয়, তবে জাগ্রত করার চেষ্টা চলছে", অর্থাৎ কানেকশন আনার চেষ্টা হচ্ছে।

কিন্তু আমাদের গোড়ায় গলদ হয়েছিল। আমরা কেউ খেয়ালই করিনি যে এই আদ্যিকালের ভারী টেলিফোনটা এই অটোমেটিকের যুগে চলবে না। এই টেলিফোনে ডায়াল করার কোনও ব্যাপার নেই।

অবশেষে একদিন সর্বনাশটা ঘটল। আমরা কেউ বাসায় নেই, সেদিন উলটো রথ না কি যেন, পিসিমা গেছেন কালীঘাট মন্দিরে, এই রকম একটা দুপুর বেলায় টেলিফোনের লোকেরা এসে কানেকশন দিয়ে গেল আমাদের বাড়িতে।

তখন বাসায় একা কাজের লোক ছিল। তাকে আগেই ভালো করে বুঝিয়ে বলা ছিল যে বাইরের ঘরের টেবিলে বিবি এগারো বারোর পাশেই নতুন টেলিফোনটা বসবে। কারণ আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে দুপুরবেলায় যখন আমরা কাজে কর্মে বাড়ির বাইরে থাকব তখনই কানেকশন দিতে, লাইন বসাতে টেলিফোন অফিসের লোক আসবে। তাই আসে।

কিন্তু আমরা ভাবতে পারিনি যে পিসিমাও বাড়িতে থাকবেন না। পিসিমা বাড়িতে থাকলে তাঁর আরাধ্য দেবতা বিবি এগারো বারো আমাদের হাতছাড়া হত না, হাতছাড়া হওয়া সম্ভব ছিল না।

দুই ফোর এইট ওয়ান ওয়ান ওয়ান টু

আটচল্লিশ এগারো বারোর বৃত্তান্ত আরম্ভ করার আগে বিবি এগারো বারো কী করে আমাদের হাতছাড়া হয়েছিল সে কথা অবশ্যই বলতে হবে। আসলে দুটো একই ব্যাপার।

সেই উলটোরথ নাকি ঝুলন পূর্ণিমা তা সে যাই হোক না কেন, এক ঝিরিঝির বরষার পুণ্য দিবসে টেলিফোন কোম্পানির লোকেরা আমাদের কালীঘাটের বাড়িতে টেলিফোন বসিয়ে গেল।

আমাদের বহুকালের অভিভাবিকা পুরনো কাজের লোক কুড়ানির মা তখন আমাদের দেখাশোনা করত। সে দেশ থেকে আমাদের কাছে এসেছিল, আমাদের কাছেই আমৃত্যু ছিলো। তার কেউ ছিল কি না তার কোনও খবর আমরা রাখতাম না, সেও বোধহয় রাখত না। তার মৃত্যুর পরে কেওড়তলা শ্মশানে দাদা তার মুখাগ্নি করেছিল।

কুড়ানির মার কথা কবে যেন অন্য কোথায় লিখেছিলাম এখানে শুধু একটা কথা বলে রাখি। কুড়ানির মা'র আসল নাম ছিল কুড়ানি, শুধুই কুড়ানি। কিন্তু বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে এত তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যায় যে স্বাভাবিকভাবেই আমরা তাকে কুড়ানির মা বলে ডাকতে থাকি এবং সেও এতে মোটেই আপত্তি করেনি। শুধু একবার বলেছিল, "আমি আবার মা ছিলাম কোন্ জন্মে?"

কুড়ানির মা আমাদের সব জিনিসপত্র এমনকি স্মৃতি পর্যন্ত আগলে রাখত। হঠাৎ হঠাৎ বলে বসত, "আজ তো বৈশাখ মাসের প্রথম রবিবার, আজ বিকেলে তো হরিপাগলার মেলা।" কোথাকার কে হরিপাগলা, কবেকার এক গেঁয়ো মফঃস্বল শহরের উপান্তে তার নামে মেলা বসত বাংলা সনের প্রথম রবিবারে, কুড়ানির মা ছাড়া সে সব স্মৃতি কেই বা মনে রেখেছিল?

কুড়ানির মা ছাড়া কেই বা দীপান্বিতা শ্যামাপুজোর আগের ভূত চতুর্দশীর সন্ধ্যায় হঠাৎ প্রদীপের সলতেগুলোয় বাতি জ্বালাতে জ্বালাতে বলে উঠত, "এই সন্ধ্যায় বড়বাবা স্বর্গে গিয়েছিল", বড়বাবা মানে আমাদের ঠাকুরদা।

আমাদের মা-বাবা তখন দেশে রয়েছেন, আমরা পিসিমার সঙ্গে কলকাতায়, কুড়ানির মা'ও দেশ থেকে এসেছে। সেও ছোটবেলা থেকেই আমাদের দেখছে।

এতদিন পরে মনে হয় আমাদের অভিভাবকত্ব নিয়ে আমাদের ভালমন্দ দেখাশোনার ব্যাপার পিসিমার সঙ্গে বুঝি তাঁর অদৃশ্য একটা রেষারেষি ছিল।

সে যা হোক। একটা ব্যাপার খুবই পরিষ্কার ছিল যে পিসিমার বিবি এগারো বারো ওরফে বিবি ওয়ান ওয়ান ওয়ান টু-কে সে একদম সমীহ করত না, তার দেবত্বে বিশ্বাস করত না। মোট কথা বি বি এগারো বারোর প্রতি তার কোন ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল না।

আমাদের বাড়িতে যেদিন টেলিফোন এল সেদিন দুপুরে শূন্যবাড়িতে কী হয়েছিল জানি না, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে এসে দেখি পিসিমা খুব চেঁচামেচি করছেন।

কুড়ানির মাকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, দুপুরে ফোনের লোকেরা এসে নতুন ফোন বসিয়ে দিয়ে পুরনো ফোন নিয়ে চলে গেছে।

পিসিমা কালীমন্দির থেকে ফিরে আসার পরে সে এ সব কথা পিসিমাকে কিছুই বলেনি, বলার প্রয়োজন বোধ করেনি, এখন সন্ধ্যাবেলায়, এই একটু আগে পিসিমা আরতি দিতে গিয়ে দেখেন বিবি এগারো বারো নেই, তার জায়গায় একটা তন্বী, আধুনিকা, ছিমছাম নতুন যুগের দূরভাষ যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আমরাও ব্যাপারটায় খুব চটে গেলাম। নতুন ফোনের জন্যে টাকা দিয়েছি, নতুন ফোন আসবে, ঠিক কথা, কিন্তু সেই জন্যে পুরনো ফোনটা, যেটার কোনও কানেকশন নেই, যেটা টেলিফোন কোম্পানি আমাদের দেয়নি, সেটা টেলিফোনের লোকেরা নিয়ে যাবে কেন?

আমরা ঠিক করলাম পরদিন টেলিফোন অফিসে গিয়ে বিবি এগারো বারোকে উদ্ধার

করব। কিন্তু পিসিমা তাতে রাজি হলেন না, বললেন, "বিবি এগারো বারো নাম আর মুখে এনো না। ওটা এঁটো হয়ে গেছে, ওটাকে আর ঘরে আনা যাবে না।"

ব্যাপারটা আমরা ভাল বুঝলাম না। পিসিমা বললেন, দেবতা অপবিত্র হয়ে গেলে বিসর্জন দিতে হয়। ওটাকে উদ্ধার করে আমরা যেন গঙ্গায় ফেলে দিই।

গোলমালে বাড়িতে নতুন ফোন আসার আনন্দটাই মাটি হতে বসেছিল। আমরা এবার নতুন ফোনটাকে দেখতে লাগলাম। রিসিভারটা তুলে দেখলাম ডায়ালটোন নেই, মৃত। তার মানে রিসিভারটা দিয়ে গেছে এখন কানেকশন দেয়নি।

ফোনটার পায়ে একটা টিকেট ঝোলানো আছে, দেখা গেল তাতে ফোনের নম্বরটা লেখা রয়েছে। সেটা পড়েই দাদা চেঁচিয়ে উঠলো, "কি আশ্চর্য, এটাও এগারো বারো দেখছি।"

অবাক হয়ে আমরা সবাই উঁকি দিয়ে দেখলাম টিকিটের গায়ে ফোনের নম্বর দেয়া রয়েছে ৪৮-১১১২, ফোর এইট ওয়ান ওয়ান ওয়ান টু।

আশ্চর্য মিল, অসম্ভব যোগাযোগ। এবং তখনই আমরা বুঝতে পারলাম নম্বরের এই সাদৃশ্যের জন্যেই পুরনো ফোনের বদলে নতুন ফোন আসছে, এই কথা ভেবেই টেলিফোন অফিসের লোকেরা পুরনো বাতিল ফোনযন্ত্রটা অর্থাৎ আমাদের বিবি এগারো বারোকে নিয়ে গেছে। তার বদলে বসিয়ে দিয়ে গেছে আটচল্লিশ এগারো বারো।

এর পরে আমরা প্রায় প্রতিদিন টেলিফোন অফিসে যাতায়াত করলাম। দুটো কারণ, (এক) বিবি এগারো বারোকে উদ্ধার করার জন্যে, (দুই) আটচল্লিশ এগারো বারোয় প্রাণ সঞ্চার করার জন্যে।

দুটোর কোনওটারই কিন্তু কোনও সুরাহা হল না।

বিবি এগারো বারো গুদামে জমা পড়ে গিয়েছিল। অনেকগুলো গুদাম ঘর তার মধ্যে শত শত মৃত টেলিফোনের শবদেহ, বর্তমানে বা ভবিষ্যতে সেগুলো কার কি কাজে লাগবে সেটা কেউ জানে না।

দু চারদিন চেষ্টা করার পরই বোঝা গেল গুদাম থেকে বিবি এগারো বারোকে পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব। তাছাড়া টেলিফোন অফিসের কাউন্টারের দিদিমণি ইতিমধ্যে নানারকম বিপজ্জনক প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন।

আমাদের কানেকশন ছিল না তবু রিসিভার পেলাম কোথা থেকে, ঐ বাতিল পুরনো রিসিভার আমাদের কি কাজে লাগবে, রিসিভারটার নম্বর মিলিয়ে দেখতে হবে ওটা চোরাই রিসিভার কি না। এই সব খারাপ প্রশ্ন।

আমি তখন অল্প কিছুদিন ল কলেজে যাতায়াত আরম্ভ করেছি। ফৌজদারি দণ্ডবিধির 'রিসিভার অফ স্টোলেন প্রপার্টিস' কথাটির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। রিসিভার অফ স্টোলেন রিসিভার হলে কি হতে পারে, ভয় পেয়ে পিছিয়ে এলাম। বিবি এগারো বারোর আশা ছেড়ে দিলাম।

কিন্তু আটচল্লিশ এগারো বারো, ঐ ফোর এইট ওয়ান ওয়ান ওয়ান টু ফোনটাও চালু হল না। প্রত্যেক দিনই শুনি পরের দিনই কানেকশন পাওয়া যাবে। বৃষ্টিতে রাস্তায় জল জমে কেবল ডুবে গিয়েছে, জল শুকোলেই লাইন ঠিক হবে। যার লাইন দেয়ার কথা, সেই যন্ত্রীর চিকেন পক্স হয়েছে। অথবা, তিনি শ্রীরামপুর থেকে আসেন এখন রেল অবরোধ চলছে বলে আসতে পারছেন না।

একেকদিন একেকসময় একেকরকম অজুহাত। অনেক সময় বিরক্তি ও উষ্মা প্রকাশ। আমরা প্রায় হাল ছেড়েই দিয়েছিলাম।

হঠাৎই চার সপ্তাহের মাথায় একদিন সকাল আটটা বত্রিশ মিনিট একুশ সেকেন্ডে, সময়টা আমরা ডায়েরিতে নোট করে রাখি টেলিফোন কর্তৃপক্ষকে জানানোর জন্যে, টেলিফোনটা পরপর তিনবার টিং টিং করে বেজে উঠল। হৈচৈ পড়ে গেল আমাদের বাড়িতে, কিন্তু ফোনটা তুলে কোনো ডায়ালটোন পাওয়া গেল না।

এর পরেও কিছুক্ষণ পরপর ঐ রকম তিনবার টিং টিং হতে লাগল। আমরা বিশদ বিবরণ এবং সময়-টময় জানিয়ে টেলিফোন অফিসে চিঠি দিলাম।

দিন পনেরো পরে টেলিফোন দপ্তর থেকে জানা গেল আমাদের রিসিভারটা খারাপ হয়ে গেছে ওটা বদলাতে হবে।

রিসিভারটা ভালোই বা ছিল কবে যে খারাপ হয়ে গেল, তা বুঝতে পারলাম না। কিন্তু কি করে খারাপ রিসিভারের কথাটা জানাজানি হয়ে গেল। দলে দলে লোক টেলিফোন কোম্পানি থেকে আসছি বলে আমাদের বাড়িতে এসে কড়া নাড়তে লাগল এবং লোভনীয় সব রঙের রিসিভার দেখাতে লাগল, মাত্র একশো টাকার বিনিময়েই যে কোনও একটা পাওয়া যাবে।

আমরা বেছে-বুছে একটা হালকা গোলাপি রঙের ফোন পছন্দ করলাম। কিন্তু অসুবিধে হল পিসিমাকে নিয়ে, বর্তমান আটচল্লিশ এগারো বারোর আরাধনা ইতিমধ্যেই পিসিমা শুরু করে দিয়েছেন। সেই ফুল, বেলপাতা, চন্দন, সিঁদুর, বাতাসা নকুলদানার প্রসাদ সবই চলছে।

পিসিমাকে অনেক কষ্টে বোঝানো হল, এটাও আটচল্লিশ এগারো বারো, শুধু রংটাই যা আলাদা।

গোলাপি টেলিফোনটা বসল আমাদের বাড়িতে এবং একটু উন্নতিও দেখা গেল।

না। ডায়ালটোন নয়। শুধু টিং টিং শব্দ বেরোতে লাগল। আগের মতো কিছুক্ষণ পরপর তিনবার টিং টিং নয়। সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা-সারা রাত শুধু টিং টিং, টিং টিং।

প্রথমে মৃদুভাবেই আরম্ভ হয়েছিল ঐ টিং টিং ধ্বনি, কিন্তু ক্রমশ সেটা উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠতে লাগল। দু চারদিন পরে আমরা বুঝতে পারলাম টেলিফোনটা রিসিভার থেকে তুলে নামিয়ে রাখলে আর টিং টিং করে না।

আমাদের পিসিমা কিন্তু সুযোগটার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। সন্ধ্যারতির পর খঞ্জনী বাজিয়ে পিসিমা মিনিট পনেরো হরিবোল হরিবোল করতেন। বাঁ হাতে বাত হওয়ায় তখন খঞ্জনীটা বাজাতে কষ্ট হত।

গোলাপি টেলিফোনটা পিসিমার খঞ্জনী বাজানোর কষ্ট লাঘব করল। সন্ধ্যাবেলায় পনেরো মিনিটের জন্যে রিসিভারটা যুক্ত করে দেওয়া হত, সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার টিং টিং শব্দ বেরোত আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পিসিমা হরিবোল হরিবোল সঙ্কীর্তন করতে লাগলেন।

ভালোই চলছিল ব্যাপারটা, হঠাৎ এর মধ্যে ফোন আসা আরম্ভ হল। টিং টিং নয় ঐ টিং টিংয়ের মধ্যেই সত্যিকারের ফোন বাজার ক্রিং ক্রিং শব্দ।

প্রথম ফোনটা এল জাপান কিংবা মাদ্রাজ থেকে। লোকটা কি বলল কিছুই বুঝতে

পারলাম না। ছুটে গিয়ে ফোনটা প্রথমে বিজন ধরেছিল, একটু পরে আমার হাতে দিয়ে বলল, "কিছু বুঝতে পারছি না। লোকটা জাপানি ভাষায় কথা বলছে।" আমার কিন্তু ফোনটা ধরে মনে হল তামিল ভাষায় কথা বলছে, মাদ্রাজ কিংবা শ্রীলঙ্কা থেকে নিশ্চয়।

আরও নানারকম ফোন শেষ রাতে, মধ্য রাতে, মধ্য দুপুরে আসতে লাগল। আমরা কিন্তু ফোন করতে পারতাম না, তবে ধরতাম।

দাদা বুঝতে পেরেছিল। দাদা বলল, "এ সব ফোন আসছে ইউনাইটেড নেশন থেকে। তোরা কেউ ধরবি না। আমার সঙ্গে পরামর্শ চাইছে।"

ফোন বাজলেই দাদা ধরে ইংরেজিতে জবাব দিত, "নো, নো, ফিলিপাইনসে আর গম নয়', 'ইয়েস ইয়েস পাকিস্তান তিনটে ছোট আণবিক বোমা বানানোর চেষ্টা করছে", 'ইয়েস ইয়েস। সুইডিশ ব্যাঙ্ক', 'নো নো নো অ্যাকাউন্ট', ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সবের পরিণতি কী হতে পারে তা আমরা মোটেই বুঝতে পারিনি।

হঠাৎ একদিন খুব ভোরবেলায় আটচল্লিশ এগারো বারোর মধ্য থেকে সাইরেনের ভোঁও-ও শব্দে আমাদের সকলের ঘুম ভাঙল।

বাইরের ঘরে ছুটে গিয়ে দেখি টেবিলের উপরে, টেলিফোনের রিসিভারটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নাচছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রিসিভারটার দু প্রান্ত দিয়ে নীল ধোঁয়া বেরোতে লাগল, কি রকম একটা প্ল্যাস্টিক পোড়ার গন্ধ। তারপরে দুম করে একটা শব্দ হল। টেলিফোনটা ঘন নীল ধোঁয়ার মধ্যে আড়াল হয়ে গেল। সব জানালা খুলে দিলাম, কিছুক্ষণ পরে জানালা দিয়ে ঐ নীল ধোঁয়া বেরিয়ে যেতে দেখি সব শূন্য, টেলিফোনটা নেই; মহাশূন্যে পরমব্রহ্মে লীন হয়ে গেছে।

কিন্তু সম্পূর্ণ লীন বোধহয় হল না। সন্ধ্যাবেলায় পিসিমার সঙ্গে আমরাও স্পষ্ট খঞ্জনীর ধ্বনি শুনতে পেতাম, পিসিমা তালে তালে হরিবোল গাইতেন।

বোধহয় টেলিফোনটা ভূত হয়ে গিয়েছিল। এর পর থেকে একটা টেলিফোনের ছায়া সারাদিন আমাদের বাড়িময় ঘুরে বেড়াত। কখনও অবিচ্ছিন্ন মৃদু টিং টিং শোনা যেত, কখনও অবিশ্বাস্য ক্রিং ক্রিং শুনে আমরা চমকে উঠতাম, অন্যমনস্কভাবে ফোনটা ধরতে যেতাম। ধরতে না পারলেও বেশ শুনতে পেতাম, 'হ্যালো, হ্যালো', কে যেন জাপানি না মাদ্রাজি ভাষায় কি বলছে।

আমরা বুঝতে পারতাম যে টেলিফোনটা আমাদের বাসাতেই রয়েছে, আমরাই শুধু সেটাকে দেখতে পাচ্ছি না।

কালীঘাটের বাড়ি থেকে আমরা বহুকাল চলে এসেছি। দাদা, কুড়ানির মা বিগত।

তবে পিসিমা আছেন। হঠাৎ কখনও কখনও বিবি এগারো বারোর কথা বলেন। তখনই আমাদের আটচল্লিশ এগারো বারোর ভৌতিক স্মৃতি মনে পড়ে। ভয়ে গা শিউরে ওঠে।

জানি না কালীঘাটের সে বাসায় এখন কারা আছে, আটচল্লিশ এগারো বারোর বিদেহী আত্মা এখনও সে বাড়িতে ঘুরে বেড়ায় কি না তাও জানি না।

নস্যি

নস্যি শব্দটা স্ত্রীলিঙ্গ, নস্য থেকে নস্যি। নস্য হল পুংলিঙ্গ, তাই থেকে স্ত্রীলিঙ্গে নস্যি। যেমন নদ ও নদী।

ছোট বয়েসে আমরা যা কিছু শিখি বা জানি তার সব কিছু ঠিক নয়। হয়তো নস্য-নস্যি, পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গের এই ব্যাপারটাও ভুল শিখেছিলাম।

যিনি ভুল শিখিয়েছিলেন সেই সরসীপিসির ওপরে কিন্তু আমাদের আস্থা ছিল খুব। শুধু আমাদের কথাই নয় আমাদের ছোট শহরটার সবাই সরসীদিকে এক নামে চিনত, তখনকার সতেরো-আঠারো বছর বয়েসী শ্যামলা, একহারা চেহারার মেয়েটিকে সবাই মান্য করত।

মান্য করার কারণও যথেষ্ট ছিল।

হিসেবমতো আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার বছর সেটা।

ম্যাট্রিক?

প্রৌঢ় পাঠক, প্রৌঢ়া পাঠিকা তোমাদের কি এখনও মনে আছে ম্যাট্রিক? স্মৃতি-বিদ্যালয়ের দোরগোড়ায় ম্যাট্রিক শব্দটা হঠাৎ ঘণ্টার মতো বেজে উঠল।

আমি ছিলাম শেষবারের ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। তারপর ম্যাট্রিক উঠে গিয়ে এল স্কুল ফাইনাল। সে স্কুল ফাইনালও কবে উঠে গেছে, এল সেকেন্ডারি, আমার ছেলেকে সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। সব চেয়ে বেশি দিন চার দশকেরও বেশি কাল ধরে চলেছিল ম্যাট্রিক। আমি আমার বাপ-কাকা সবাই ম্যাট্রিক দিয়েছিলাম। তার আগে এন্ট্রান্স চলেছিল সেই ইংরেজি শিক্ষার গোড়া থেকে, আমার জ্যাঠামশায়, ঠাকুর্দা, ঠাকুর্দার বাবা সবাই ছিলেন এন্ট্রান্স পাশ। এই ধারাবাহিকতা চলেছিল এই শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত। মধ্যে তো উঠেই গিয়েছিল প্রায় দশ ক্লাসের এই শেষ পরীক্ষাটা, চালু হয়েছিল এগারো ক্লাসের শেষ পরীক্ষা।

এন্ট্রান্স, তারও পরে ম্যাট্রিকের যে মর্যাদা ছিল এখন বোধহয় বেঁচে নেই। আমাদের বাসায় সেকালের এন্ট্রান্স ফেল মুহুরিবাবু গর্ব করে বলতেন, একটা এন্ট্রান্স ফেল দশটা ম্যাট্রিক পাশের সমান।

এতকাল পরে এন্ট্রান্স পাস লোক আর একজনও বোধহয় বেঁচে নেই। আমার ক্ষমতা বা সম্বল থাকলে এই এন্ট্রান্স প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হওয়ার আগে শেষ মানুষটিকে খুঁজে বার করে সংবর্ধনা দিতাম। তবে আমার মতই ম্যাট্রিক পাস লোকেরা এখনও আছেন, পঞ্চাশের খারাপ দিকে, ষাটের কোঠায়, সত্তরের আশির হয়তো বা নব্বুইয়ের কোঠায়।

একটা সাধারণ গল্পে প্রবেশিকা পরীক্ষা নিয়ে এতখানি আদিখ্যেতা না করলেও চলত। কিন্তু গল্পটা যে আমার নিজের ম্যাট্রিক পরীক্ষা সংক্রান্ত। তা ছাড়া ইতিহাসটা একটু ঝালিয়ে নেওয়া, আজেবাজে গালগল্পের চেয়ে নিশ্চয় খারাপ নয়।

সে যা হোক, সরসীপিসির কথায় ফিরি। আমাদের ঠিক দুবছর আগে সরসীপিসি ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন ফার্স্ট ডিভিশনে, সংস্কৃতে আর ভূগোলে লেটার পেয়ে। ভূগোল তখন ছিল পঞ্চাশ নম্বরের হাফ পেপার, তার মধ্যে চল্লিশের বেশি পাওয়া সোজা কথা

pathagar.net

নয়। তা ছাড়া সংস্কৃতে লেটার পাওয়াও রীতিমতো অসম্ভব ব্যাপার, সেকালের পণ্ডিত-মশায়েরা সংস্কৃত খাতা খুব কড়া করে দেখতেন, সামান্য অনুস্বর বিসর্গ একচুল এদিক ওদিক হলে আর রক্ষা নেই। কত ছাত্র সংস্কৃতে ফেল করে ম্যাট্রিক পাস করতে পারত না তার ইয়ত্তা নেই। তা ছাড়া সংস্কৃত তখন আবশ্যিক বিষয় ছিল, হিন্দু ছেলেদের সংস্কৃত আর মুসলমান ছেলেদের আরবি বা ফারসি বাধ্যতামূলক ছিল। কারণ এগুলো ধর্মভাষা। যেমন ইংরেজি ছিল রাজভাষা, বাংলা মাতৃভাষা।

ধর্মভাষা পড়ানোর জন্যে সব স্কুলেই কয়েকজন পণ্ডিত ও মৌলভি থাকতেন। পদমর্যাদা অনুসারে হেডপণ্ডিত, ফার্স্ট পণ্ডিত, সেকেন্ড পণ্ডিত, ফার্স্ট মৌলভি, সেকেন্ড মৌলভি ইত্যাদি বলা হত। তবে সম্বোধন করা হত 'পণ্ডিতমশায়' কিংবা 'মৌলভি সাহেব'।

আমার দাদা পড়ত আমার থেকে এক ক্লাস ওপরে আর সরসীপিসির এক ক্লাস নীচে। দাদা এইট থেকে নাইনে উঠতে সব বিষয়ে পাস করেছিল, তবু সংস্কৃতে চৌদ্দ পেয়ে সেকেন্ড কলে প্রমোশন পেল।

দাদার সংস্কৃতে ভয় ধরে গিয়েছিল। দাদা বাসায় কাউকে কিছু না বলে নাইনে ওঠার পর ভাঁড়ার ঘর থেকে চুরি করে এক বোতল কাসুন্দি আর এক বয়াম আমের আচার দিয়ে হেড মৌলভি সাহেবকে বশ করে। তিনি রাজি হয়ে যান দাদাকে আরবি ক্লাসে নিতে। সে সময় দেখেছি দাদা লুকিয়ে 'আলিফ-বে-পে-তে-সে, এই সব কি যেন বিড়বিড় করত চোখ গোল-গোল করে, পরে জেনেছিলাম সেগুলো আরবি বর্ণমালা। কিন্তু দাদার সে সাধ পূর্ণ হয়নি, হেডমাস্টার মহোদয় সৎ ব্রাহ্মণের ছেলেকে আরবি নিয়ে পড়তে অনুমতি দেননি, কি যেন বিধিগত কুট বাধা ছিল কোথায়।

এ খবর বাসায় পৌঁছলে একটু শোরগোল হয়েছিল। তবে দাদার ব্যাপার-স্যাপার ছিল আলাদা। দাদাকে কোনও বিষয়েই কেউ বিশেষ ঘাঁটাত না। শুধু ঠাকুমা তাকে বলেছিলেন, "পশ্চিমবাড়ির সরসী তো খুব ভাল সংস্কৃত জানে, তুই তার কাছে শিখে নে।"

দাদা গর্জে উঠেছিল, "সরসী তো শত্রুপক্ষের মেয়ে। তোমার গতবারের কথা মনে নেই। ওর কাছে কি শিখব, ও ইচ্ছে করে ভুল শেখাবে।"

দাদা এই কথাগুলো যখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঠাকুমাকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিল, সরসীপিসি তখন ওঁদের বাড়ির জানালার পাশে টেবিলের সামনে এসে খাতায় কি যেন লিখছিলেন, দাদার কথা শুনে একবার মুখ তুলে জানালা দিয়ে দেখে ফিক করে হেসে আবার লেখায় মনোনিবেশ করলেন।

আমি বারান্দায় দাদার পাশেই ছিলাম। দাদার সদ্য ব্যবহৃত 'শত্রুপক্ষের' মেয়ে কথাটি আমার চেনা। কয়েকদিন আগেই এই নামে একটা নতুন বই এসেছে আহমদিয়া লাইব্রেরির শো কেসে, ইস্কুল যাওয়ার পথে দাদা আর আমি দুজনেই সেটা দেখেছি। ঢাকা বা কলকাতা থেকে নতুন কোনও বই এলে প্রথম কিছুদিন সেগুলো কাচের শো কেসে রাখা হত। খালধারের বইয়ের দোকানগুলোর পাশ দিয়ে ইস্কুলে যাতায়াতের পথে আমরা সেগুলো খুঁটিয়ে দেখতাম।

এখনও সরসীপিসির কথাই শুরু হল না। শত্রুপক্ষের ব্যাপারটা যথা সময়ে বলা যাবে।

সরসীপিসি যেবার ম্যাট্রিক পাস করলেন সে বছর আমাদের শহরের মাত্র পাঁচজন ম্যাট্রিকে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিল, তার মধ্যে সরসীপিসি একা মেয়ে। শুধু তাই নয় আমাদের শহরে অনেককালের মধ্যে মাত্র দুটি মেয়ে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিল, তার একজন ওই সরসীপিসি আর অন্যজন সরসীপিসিরই দিদি অতসীপিসি। ম্যাট্রিক পাস করার পর পর আমাদের তখন খুব অল্প বয়েস, অতসীপিসির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। এখনো একটু একটু মনে পড়ে বিয়ের বাসরঘরে অতসীপিসির বর হেঁড়ে গলায় 'এখনি উঠিবে চাঁদ আধো আলো আধা ছায়াতে' গেয়েছিলেন।

এ সব অনেককাল আগেকার কথা। এত বছর পরে অত অল্প বয়েসের কোনও কিছু মনে থাকার কথা নয়। কিন্তু কেমন যেন মনে পড়ে সেদিন খুব ঘন জ্যোৎস্না উঠেছিল। বাসরঘরের সামনের উঠোনে এক ঝাঁক কাঠচাঁপা গাছের ফুল-পাতা মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল চাঁদের আর হ্যাজাকের আলোয়।

অতসীপিসিমার বাসরঘর হয়েছিল আমাদের দালানের সবচেয়ে বড় ঘরটায়, যে ঘরটায় আত্মীয়স্বজন এলে থাকতেন। তখন আমাদের ওখানে এরকমই হত। পাড়ায় একটা বিয়ে-পৈতে-অন্নপ্রাশন হলে ব্যাপার হত আশেপাশের বেশ কয়েকটা বাড়ি মিলে। বিয়েটা হত নিজের বাড়িতে, বরযাত্রীরা উঠত অন্য এক বাড়িতে, বাসরঘর হয়তো আরেক বাড়িতে যেখানে ভাল খালি ঘর আছে।

আমাদের পাশাপাশি বাড়ি। সরসীপিসিদের বাড়ির চলতি নাম ছিল পশ্চিমবাড়ি। লাগোয়া পাশের বাড়ি আমাদের সেই অর্থে বাড়ির পরিচয় হওয়া উচিত পূর্ববাড়ি নামে, কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে আমাদের বাড়ি হল দক্ষিণবাড়ি। এবং ততোধিক অজ্ঞাততর কারণে পূর্ববাড়ি নামে কোনও বাড়ি ছিল না। এমনকি উত্তরবাড়িও ছিল না।

এই নিয়ে কারও মনে কখনও কোনও সংশয় দেখা গিয়েছে বলে শুনিনি। আরও অনেক কিছুর মতোই এসব আমরা জন্মতক মেনে নিয়েছিলাম। বোধহয় শহর যখন নতুন পত্তন হয় সেই সময় সীমানা-নির্দেশক এই সব নামকরণ হয়েছিল। আর নামাঙ্কিত বাড়িগুলোও স্থান বদল করেছিল। আমাদের বাড়িই নাকি আগে ছিল নদীর পাশে, বারবার ভাঙনের মুখে শহরের এ পাশে উঠে এসেছিল। স্থানবদল, দিকবদল হয়েছিল কিন্তু বাড়ির নামবদল হয়নি।

পুরনো দিনের কথা লিখতে গিয়ে কি যে সব অবান্তর কথা চলে এল। স্মৃতিঠাকুরানির ঝুলিতে কি যে অবান্তর আর কি যে অবান্তর নয় আমি হেন সামান্য রচনাকার সেটা কিছুতেই ধরতে পারি না।

বরং সরসীপিসির কথা যেটুকু এখনও মনে আছে, শেষবার ভুলে যাওয়ার আগে সেটা লিখে রাখি।

সরসীপিসি দেখতে সুন্দরী ছিলেন না। শ্যামলা, ছিপছিপে বাঙাল মফঃস্বল শহরের ফ্যাসানহীন অনাধুনিকা। একটু আধুনিকতা অবশ্য ছিল, সেটা হল পুরনো বাংলা ধরনে শাড়ি না পরে ড্রেস করে মানে আজকালকার মতো কুচিয়ে শাড়ি পরা।

সুন্দরী না হলেও বুদ্ধিমতী ছিলেন সরসীপিসি। বুদ্ধি ও মেধা তাঁর যথেষ্টই ছিল। তাঁর চোখেমুখে বুদ্ধির একটা আভা খেলে যেত। তবে তার সবটাই সুবুদ্ধি নয়। কিছুটা দুষ্টবুদ্ধিও ছিল।

না হলে, শুধু শুধু আমাকে কেন শিখিয়েছিলেন লিঙ্গ পরিবর্তন করে নদ যেমন নদী হয়, বালক যেমন বালিকা হয়, সিংহ হয় সিংহী, তেমনিই নস্য হয়ে নস্যি।

এই গল্পের নাম 'নস্যি'। সেই জন্যেই বোধহয় নস্যির প্রসঙ্গটা স্বাভাবিকভাবেই এসে গেল।

আমাদের সেই বাল্যকাল, সেটা ছিল নস্য না নস্যির সুবর্ণযুগ। নস্যির দোকান যত্রতত্র, যে কোনও দোকানে নস্যি।

নস্যিই বা কতরকম। র, পরিমল, রোজ। তার কত রকম গন্ধ। র নস্যির কড়া ঘ্রাণ, রোজের গোলাপি সৌরভ, পরিমলে মধুর সুবাস।

উকিল-ডাক্তার, মাস্টার-ছাত্র, মুহুরি-মক্কেল, ঝি-চাকর সবাই নস্যি নিত। তখন নাকি বাকিংহাম প্যালেসে রাজবাড়ির ডিনার শেষে নস্যি পরিবেশন করা হত ব্রান্ডির বা লিকারের পাশাপাশি সোনার নস্যদানিতে।

নস্যদানিও যে কত রকম ছিল। টিনের, পিতলের, রুপোর, পাথরের, হাতিব দাঁতের। তার আবার কত কারুকার্য। অধিকাংশ নস্যির নেশার লোকের পকেটে দুটো করে রুমাল, একটা ময়লা, মোটা কাপড়ের নস্যির রঙে চিত্র-বিচিত্র, অন্যটি শৌখিন সাধারণ ব্যবহারের রুমাল। বাড়ির কাজের লোক সে সব ঘৃণিত নস্য-কলঙ্কিত রুমাল কাচতে চাইত না, গিন্নিরা নিজেদের চানের সময় বাঁ হাতের আলগোছে ধরে নাক সিঁটকিয়ে কর্তব্য পালন করতেন ওই রুমাল কেচে।

নস্যি নিত না কে? হেডমাস্টার মশাইয়ের টেবিলে নস্যির আস্তর পড়ে থাকত। হেডমাস্টারমশাই যখন ঘরে থাকতেন না বুড়ো দপ্তরি চক মোছার ডাস্টার দিয়ে সেগুলো জড়ো করে নিজের টিনের কৌটোয় ভরে নিত।

জজসাহেব নস্যি নিতে নিতে সওয়াল শুনতেন। উকিলবাবু প্রকাশ্য আদালতেই নস্যি টেনে সওয়াল করতেন, তাতে আদালত অবমাননা হত না। আসামি কয়েদখানায় ঢোকার মুখে শেষ টিপ নস্যিটা নাকে দিয়ে নিত, তাকে গাবদে ঢোকানোর আগে জমাদারসাহেব তার পকেট তল্লাসি করে তার নস্যির কৌটো বাজেয়াপ্ত করলেন।

বেকার যুবক, খদ্দরের নস্যির পাঞ্জাবি পরা বিপ্লবী নেতা, বাজারের দোকানদার, দারোয়ান, কোচম্যান প্রত্যেকের পকেটে বা কোমরের খুঁটে একটা করে নস্যির কৌটো। একদিন ইস্কুল যাওয়ার মুখে ইঁদারার ধারে দাদার কাচতে দেওয়া ছাড়া জামার পকেট থেকে বেরোল এক নস্যির কৌটো। আমাদের বাড়ির পুরনো লোক সৌদামিনী দাসী সেই নস্যির কৌটো হাতে স্তূপাকৃতি ময়লা কাপড়ের বোঝা এক লাফে পেরিয়ে ইঁদারার ধার থেকে এসে পড়ল একেবারে বাড়ির মধ্যের উঠোনের মাঝখানে, সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে কপাল চাপড়াতে লাগল আর চেঁচাতে লাগল, "ওগো, আমাদের কি সর্বনাশ হল গো! বড় খোকন না একেবারে গোল্লায় গেল গো!"

বড় খোকন মানে আমার দাদা। আমি আর দাদা দুজনেই খোকন, দাদা বড় খোকন আর আমি ছোট খোকন।

সৌদামিনীর এই আর্ত বিলাপে, প্রাণাধিক কিশোর পৌত্রের পদস্খলনে যাঁর সবচেয়ে বেশি বিচলিত হওয়ার কথা ছিল সেই আমার পিতামহী তাড়াতাড়ি পুজোর ঘরের মধ্যে ঢুকে পিতলের লক্ষ্মীমূর্তির নীচে থেকে তাঁর রূপোর নস্যির কৌটো বের করে

তার থেকে এক টিপ নস্যি নিয়ে নাকে দিয়ে দ্রুত মালা জপতে লাগলেন। তখন ভাবতাম ঠাকুমা নস্যি পায় কোথায়, কে এনে দেয়। এতদিন পরে এখন মনে হয় ঠাকুর্দাই লুকিয়ে এনে দিতেন ওই নেশার দ্রব্যটি প্রিয় সহধর্মিণীকে।

সেইদিন সন্ধ্যায় দাদার এই অধঃপতন নিয়ে বাড়িতে খুব শোরগোল হল। সেদিনই সকালবেলা ঠাকুর্দার কাছে তার মক্কেল এসেছিল যারা ডাকাতি করে ধরা পড়েছে, এখন জামিনে আছে, ধরা পড়ার সময় তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে একটা করে গুপ্তি আর একটা করে নস্যির কৌটো পাওয়া গেছে—ঠাকুর্দার এন্ট্রান্স ফেল মুহুরিবাবু জানালেন। ছোট ছেলের পকেট থেকে নস্যির কৌটো বেরোনোর গুরুত্ব বোঝাতে তিনি এই খবরটা দিলেন।

দাদা কিন্তু নির্বিকার। বাড়ির নীচের বারান্দায় জটলা চলছিল। আমি আর দাদা ছাদের এক প্রান্তে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ছাদ ঘেঁষে কয়েকটা পুরনো আমগাছ, বৈশাখের শুরু, কয়েকদিন আগে নববর্ষ গেছে। আমের মুকুল ঝরে গিয়ে সদ্য গুটি ধরেছে। আবছা অন্ধকারে থোকা-থোকা আম ছবিতে দেখা আঙুরগুচ্ছের মত দেখাচ্ছে। দুয়েকদিন আগে ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেছে, কালবোশেখি। আকাশে আজকেও মেঘ উঠেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আমাদের দালানের পিছনে পুকুরপারে ব্যাঙ ডাকছে, সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাছে দূরে ঝিঁঝিঁ ডাকছে। খালের ধারে সিনেমাহল থেকে 'মানে-না-মানা' সিনেমার ডায়লগ ভেসে আসছে বাতাসে। সিনেমাটা দেখা থাকলে বেশ বোঝা যায় কোন জায়গাটা চলছে।

নীচের তলার কোলাহল স্তিমিত হয়ে এসেছে। দাদার বিচারসভা সাঙ্গ হয়েছে, দাদার ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার এ বিষয়ে প্রায় সবাই একমত হয়ে যে যার কাজে চলে গেছে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর হঠাৎ পরম দার্শনিকের মতো দাদা আমাকে বলল, 'খোকন কথাটা নস্য না-নস্যি?'

আমরা বাঙাল দেশের লোক। আমাদের কথাবার্তায় সাধুভাষার দিকে ঝোঁক বেশি। আমরা কলিকাতা বলি, লবণ বলি, আমরা নস্যি বলি বটে তবে অনেকে নস্যও বলতেন।

সবাই বলে আমি অল্প বয়েসে থেকেই একটু বেশি পাকা। তাই বোধহয় দাদার প্রশ্নের জবাবে বলেছিলাম, 'নস্য-নস্যি' দুই-ই হয়।

দাদা আমার কথায় গুরুত্ব দিল না, তার বদলে বলল, 'সরসীর কাছ থেকে একবার জেনে নিস তো। এ বছরের ঝগড়া লাগার আগেই জেনে নিস।'

সরসীপিসিদের পশ্চিমবাড়ি আর আমাদের দক্ষিণবাড়ির মধ্যে একটা বছরকার ঝগড়া ছিল, প্রতি বছরেই ঝগড়াটা হত, ঝগড়াটা চলত পুরো গ্রীষ্মকাল জুড়ে। তারপর আষাঢ়ের শেষে কিংবা শ্রাবণের গোড়ায় যখন যমুনা নদীর বেনোজল শহরের মধ্যের খাল ভাসিয়ে, রাস্তা ডুবিয়ে আমাদের উঠোনের মধ্যে ঢুকে যেত, তখন এই দুটো বাড়ি খুব কাছাকাছি চলে আসত, বিনা মীমাংসায় এক বছরের মতো বিবাদ মুলতুবি থাকত। একই ডিঙি নৌকোয় সরসীপিসিরা আর আমরা স্কুলে যেতাম, যতদিন না স্কুলের ক্লাসঘরে জল ঢুকে স্কুল বন্ধ হয়ে যেত। মক্কেলের ঢাকাই নৌকোয় করে আর সকলের সঙ্গে আদালতে যাওয়ার পথে সরসীপিসিমার বাবাকে ঠাকুর্দা তাঁর সেরেস্তায় নামিয়ে দিতেন।

ইতিহাসটা সংক্ষিপ্ত করে বলি। দুটো পাশাপাশি বাসা। মধ্যে একটা নড়বড়ে টিনের বেড়া রয়েছে। বেড়ার শেষ মাথায় একদম সীমান্ত একটা আমগাছ। খুব পুরনো বুড়ো আমগাছ।

এই গাছটা নিয়েই যত বিপত্তি। গাছটার দুটো নাম। আমাদের দক্ষিণবাড়িতে এই গাছটাকে বলা হত লালবাগের আমগাছ।

কবে সেই সম্রাট পঞ্চম জর্জ নাকি মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমলে ঠাকুরদার দাদা তাঁর ছেলেবেলায় গরমের ছুটিতে মামার বাড়ি লালবাগে বেড়াতে গিয়ে ফেরার সময় এক ঝুড়ি খুব মিষ্টি আম নিয়ে এসেছিলেন। সেই আমেরই একটা আঁটি থেকে এই গাছ হয়েছিল। বেশ কয়েক বছর পরে যখন প্রথম ফল এল সেই আম পাকলে পরে খেয়ে সবারই সেই লালবাগের আমের কথা মনে পড়েছিল, যদিও এর আঁটিতে অল্প একটু টক ছিল আর লালবাগের আম ছিল নিখুঁত মধুর।

ওদিকে ওই একই আমগাছের নাম ছিল সরসীপিসিদের পশ্চিমবাড়িতে কলমি আম গাছ। এ গাছের কলমের চারা নাকি সরসীপিসির ঠাকুমা অনন্তকাল আগে ধামরাইয়ের রথের মেলা থেকে স্বহস্তে কিনে এনেছিলেন।

সবচেয়ে গোলমাল বাধিয়েছিল দুই বাড়ির সীমানার ঠিক ওপরে এই আমগাছটার অবস্থিতি। আমি এখনও ভেবে পাই না এই একটি টোকো আমগাছ নিয়ে দুটি পুরনো সংসারের বন্ধুত্ব বছর বছর ভেস্তে যেত কি করে।

দুটি পুরনো সংসার। প্রায় একই চৌহদ্দির মধ্যে পাশাপাশি বাড়ি। একশো বছরেরও বেশি পাশাপাশি ছিলাম আমরা।

যদিও স্বজাতি নই, আমরা ব্রাহ্মণ, সরসীপিসিরা বৈদ্য, আমাদের দুই বাড়ির মধ্যে আত্মীয়তার অভাব ছিল না। সরসীপিসি, অতসীপিসি দুই বোনকেই দেখেছি ভাইফোঁটায় বাবাকে ফোঁটা দিতে। সরসীপিসি, অতসীপিসিদের যখন পাত্রপক্ষ দেখতে আসত, ওঁদের চুল বেঁধে দিতেন আমার মা সেকালের ফ্যাশনে, মাউন্ট করার স্টাইলে। ওঁরা মাকে বউদি বলতেন, বয়েসের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও আমরা মা'র ছোটখাট রঙ্গতামাশা ছিল এই দুই বোনের সঙ্গে।

সরসীপিসিদের আমরা যে পিসি বলতাম, ওঁরা যে মাকে বলতেন বউদি এবং এবাড়ি ওবাড়ির সব সম্পর্কই যে এই ছকের অধীন ছিল তার কারণ অবশ্য আমাদের ঠাকুমা।

আমাদের ঠাকুমার বাপের বাড়ি মানে বাবার মামার বাড়ি ছিল যে গ্রামে সেই গ্রামেরই মেয়ে সরসীপিসির মা, ঠাকুমার চেয়ে বয়েসে বছর পনেরোর ছোটো। ঠাকুমা পালটি ঘর দেখে, সম্বন্ধ করে পাশের বাড়ির বউ করে এনেছিলেন গ্রামের মেয়েটিকে কি যেন নাম ছিল সরসীপিসির জননীর, ঠাকুমা ডাকতেন 'হরি' বলে, রাগ করে বলতেন, "হরির বড় বাড় হয়েছে।" খুশি থাকলে বলতেন, "হরির মতো মেয়ে হয় না"।

হরি মানে, যতদূর মনে পড়েছে হরিদ্রাসুন্দরী, আমাদের নোয়াঠাকুমা। নোয়া মানে নিশ্চয় নতুন। গল্প লিখতে বসে অভিধান খুলব না, যা লিখছি তাই সত্যি। সবসীপিসির মা আমাদের ঠাকুমাকে দিদি বলতেন, সেই সূত্রে তিনি আমাদের নোয়াঠাকুমা বা নতুন ঠাকুমা।

এই সব মধুর সম্পর্ক, পাতানো আত্মীয়তা নষ্ট হয়ে যেত কালবোশেখির ঝড়ে। ঝড়ের বাতাসে যখন সীমানার আম গাছ থেকে আম ঝরে পড়ত দু বাড়ির উঠোনে, তুমুল হুলস্থূল পড়ে যেত দু বাড়িতে, দু পক্ষই দাবি করত সব আমই তাদের প্রাপ্য। কারণ গাছটা তাদের। একবার আমিন ডেকে জরিপ করে এ সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা হয়েছিল, তখন নাকি

দেখা যায় দু বাড়ির মধ্যের সীমানা চলে গেছে সরাসরি আমগাছের বিশাল গুঁড়ির মধ্যে দিয়ে। কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান হয়নি।

যতদিন গাছে আম থাকত, জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ অবধি আম নিয়ে, আম পাড়া নিয়ে তুমুল বচসা চলত দু বাড়ির মধ্যে। কয়েক দশক ধরে এই গোলমাল চলেছিল। এই বচসা উত্তরাধিকার সূত্রে আমার ঠাকুমা পেয়েছিলেন তার শাশুড়ির কাছ থেকে, নোয়াঠাকুমাও হয়তো তাই।

দু বাড়ির মধ্যে কথাবার্তা, মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যেত। টিনের বেড়ার অন্য প্রান্তে দু বাড়ির অন্দরমহলের মধ্যে যাতায়াতের একটা গেট ছিল। ঝগড়া চরমে উঠলে গেটটা পেরেক মেরে বন্ধ করে দেওয়া হত।

তখন আমি সরসীপিসির কাছে প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাবেলা যাই; সংস্কৃত অঙ্ক এই সব একটু দেখিয়ে নিই। আমি সরসীপিসি বলতাম বটে, দাদা কিন্তু তাঁর সঙ্গে বয়েসের সামান্য ব্যবধান মোটেই মান্য করত না। দাদা তাঁকে নাম ধরেই ডাকত। তবে আমার মতই দাদারও সরসীপিসির বিদ্যাবত্তা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ ছিল না।

দাদার নির্দেশেই আমি সরসীপিসিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কোনটা ঠিক, 'নস্য না নস্যি?' সরসীপিসি যখন বললেন নস্যি নস্য একই শব্দ, পুংলিঙ্গ আর স্ত্রীলিঙ্গ, সেটা দাদাকে জানাতে দাদা বলল, 'সরসী বানিয়ে বাজে কথা বলেছে। ডিকশনারি একবার দেখিস তো।'

ডিকশনারি দেখে কিন্তু কোনও উপকার হল না। আমাদের একটা পুরনো পাতাছেঁড়া ছাত্রবোধ অভিধান ছিল, হ্রস্ব ই'র আগের এবং হ'য়ের পরে সব শব্দ সেই বইয়ের থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। 'ন' অবশ্য মাঝামাঝি জায়গায় অক্ষত অবস্থাতেই ছিল। সেখানে পাওয়া গেল নস্য মানে নস্যি, নস্যি মানে নস্য।

আমাদের বাসায় একটা বড় অভিধান অবশ্য ছিল। খুব সম্ভব সুবলচন্দ্র মিত্রের কিংবা জ্ঞানেন্দ্রমোহনের। কিন্তু সেটা কাকার হেফাজতে। কাকা কলকাতায় থাকেন, যাওয়ার সময়ে ভালো করে বাঁধিয়ে কাচের আলমারিতে তালা দিয়ে রেখে গেছেন। ঠাকুর্দার কাছারি ঘরের আইনের বইগুলোর মতো লাল চামড়া দিয়ে বাঁধানো গায়ে সোনালি অক্ষরে লেখা 'বাঙলা ভাষার অভিধান', এবং তার সঙ্গে কাকার নিজস্ব সংযোজন, 'বিনা অনুমতিতে ব্যবহার নিষেধ'।

সুতরাং নস্য এবং নস্যির পার্থক্য জানা হল না। দাদার মনে একবার সন্দেহ হয়েছিল শব্দটা বোধহয় আরবি। হেড মৌলভি সাহেবকে গিয়ে এ বিষয়ে প্রশ্ন করায় তিনি দাদাকে ঠাস করে গালে একটা চড় কষিয়ে দিয়েছিলেন। অল্প কিছুদিন আগেই তিনি অপদস্থ হয়েছেন দাদাকে ছাত্র বানাতে গিয়ে, এখন এই নস্যি শব্দের উৎপত্তিসূচক প্রশ্নটি তাঁর কাছে যথেষ্টই অবমাননাকর মনে হয়েছে। তা ছাড়া তিনি নিজে একজন নামকরা নস্যিখোর, সারাদিন দু আঙুলে নাকে নস্যি গুঁজে যান। তাঁর দাড়িতে, আলখাল্লার মতো লম্বা পিরানে নস্যির ছড়াছড়ি।

দাদা কিন্তু রাগ করল না. দুঃখ পেল না মৌলভি সাহেবের আচরণে, বরং এই এক চড়ে দাদা নিজে থেকেই নস্যি নেয়া ছেড়ে দিল। আমাদের দালানের বারান্দায় পুব দিকে মুখ করে জোরে ছুড়ে ফেলে দিল সেই নস্যির কৌটো। দাদার নস্যির কৌটোটা ছিল একটু অন্যরকম, চৌকো আকারের গ্রামোফোন পিনের খালি কৌটো, যার ওপরে সেই ভুবন-বিখ্যাত

সঙ্গীতপিপাসু কুকুর ও গ্রামোফোনের চোঙার ছবি। আগের গোল টিনের কৌটোটা সেদিন আবিষ্কার হওয়ার পরে বাজেয়াপ্ত হওয়ায় দাদা তারপর থেকে এই কৌটোটা ব্যবহার শুরু করে, এটার সুবিধে এই যে এর বিসদৃশ আকারের জন্যে এটাকে নস্যির কৌটো বলে হঠাৎ সন্দেহ করা কঠিন।

দাদার মনে কী ছিল জানি না। ভর সন্ধেয় দালানের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাদা সজোরে কৌটোটা উঠোনের ওপর দিয়ে ছুড়ে দিল। ওপারে জানালার ধারে তন্ময় হয়ে বসে সরসীপিসি লণ্ঠনের আলোয় লেখাপড়া করছিলেন। কি করে যে কি হল, সেই কৌটো কোনাকুনি জানালা দিয়ে ঢুকে লাগল সরসীপিসির ডানচোখের ঠিক ওপরে। তারপর একেবারে যাকে বলে রক্তারক্তি কাণ্ড। সরসীপিসির ডান ভুরুর ওপরে কেটে গিয়েছিল। ঠিক কতটা কেটে গিয়েছিল বলা কঠিন, কারণ আমাদের বাড়ি থেকে কেউই সেটা দেখতে যায়নি বা খোঁজ নিতে যায়নি।

সেই সন্ধ্যায় হাত-পা ছুড়ে সরসীপিসির আর্তনাদ, সরসীপিসির হাত ছোড়ার ফলে টেবিল থেকে হ্যারিকেন লণ্ঠনটি পড়ে গিয়ে ভেঙে যাওয়া, কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধতা, তারপর হই হট্টগোল, চিৎকার চেঁচামেচি, শুধু থানা-পুলিশ হয়নি।

তবে সেদিন আমরা টু শব্দটিও করিনি। করার উপায়ও ছিল না। শুধু ঠাকুমা গোপনে দাদাকে শহরেরই অন্য এক পাড়ায় ঠাকুমার এক দূর সম্পর্কে বোনের বাড়িতে চালান করে দিয়েছিলেন।

আম-পাকার মরসুম চলছে সেটা। এর আগে কয়েকদিন ধরেই দু বাড়িতে ঐ লালবাগি তথা কলমিগাছের আম নিয়ে অষ্টপ্রহর খিটিমিটি গালাগাল বাকবিতণ্ডা চলছিল। আজ দাদার নস্যির কৌটো ছোড়ায় এবং তজ্জনিত সরসীপিসির আঘাতে ব্যাপারটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছল।

পুরো গ্রীষ্মটা এই রকম গেল। ওই একই ধারাবাহিকতায়। তারপর একদিন গাছের শেষ আমটি ফুরোল। এরই মধ্যে একদিন অম্বুবাচীর শেষদিন শেষ রাতে শহরবাসী হঠাৎ ঘুমঘোরে বিছানায় জেগে উঠে শুনতে পেল শোঁ-শোঁ, শোঁ-শোঁ শব্দ; সম্বৎসর যেমন হয়, যমুনার জল তোড়ের মুখে শহরের পাশের ছোট নদী ছাপিয়ে শহরের ভেতরের খালের মধ্যে ঢুকছে তারই উচ্ছ্বাস।

এক সপ্তাহের মধ্যে বেনোজল রাস্তাঘাট পুকুর সব একাকার করে দিয়ে শহরের ভেতরে ঢুকে পড়ল। আমাদের বাড়িগুলো ছিল ডাঙা জমিতে, নাবাল জমির উঠোন ডুবিয়ে প্রথমদিন সরসীপিসিদের উঠোনে তারপর দিন আমাদের উঠোনেও জল ঢুকে গেল। প্রথমে পায়ের পাতা ডোবা জল, তারপর আধ হাঁটু, শেষপর্যন্ত আধ কোমর জল। তবে জলের দেশের লোক আমরা, আমাদের ঘর-দালানের ভিটে এত উঁচু করা হত যে কখনোই শোয়ার ঘরের মধ্যে জল ঢুকত না। গোয়ালঘর, ভাঁড়ারঘর, ঢেঁকিঘর এসবের ভিটে উঁচু হত না, এসব ঘরে জল ঢুকে যেত।

সরসীপিসিদের একটা দুধের গাই আর বাছুর ছিল। আমাদেরও দুয়েকটা গরু ছিল। গোয়ালঘরে জল ঢুকতেই আমাদের গরুগুলোর সঙ্গে বিনা বাক্যব্যয়ে সরসীপিসিদের গাইবাছুর আমাদের বাইরের বারান্দায় স্থানান্তরিত হল।

সরসীপিসির বাবা দেলদুয়ারের গজনভিদের সদর সেরেস্তার নায়েব ছিলেন। তাঁর

এক প্রজা বর্ষার ফল এক ধামা অম্লমধুর নটকা দিয়েছিল, তার অর্ধেক আমাদের বাড়িতে এল। ইতিমধ্যে বর্ষার জলের তোড়ে দুবাড়ির ভেতরের দরজা আবার খুলে গেল।

সরসীপিসিদের রান্নাঘরের বারান্দায় অল্প জল উঠেছিল। একদিন সন্ধ্যার দিকে নোয়া ঠাকুমা সেই বারান্দা থেকে একটা বড় বেতের ধামা চাপা দিয়ে একটা বেশ বড়, অন্তত তিন চার সের কাতলা মাছ ধরে ফেললেন। বর্ষার জলে মিউনিসিপ্যালিটির পুকুর উপচিয়ে সব বড় বড় মাছ বেরিয়ে গিয়েছিল। এটা তারই একটা।

সেদিন রাতে আমাদের বারান্দায় রীতিমতো ফিস্টি হল। অনেকদিন পরে পেতলের ডুমলণ্ঠনটা মেজে ঘসে বারান্দায় টানায় ঝুলিয়ে দেওয়া হল। সারা সন্ধ্যা ধরে তার আলো দুলতে লাগল উঠোনের জলে।

সামান্য আয়োজন; খিচুড়ি, দু চামচে করে খাঁটি গাওয়া ঘি আর কাতলামাছ ভাজা। স্পেশ্যাল আইটেম ছিল কাতলামাছের কাঁটার ঝাল-চচ্চড়ি। গাছকোমর করে শাড়ি বেঁধে সারা সন্ধ্যা বসে নিজের হাতে তরকারি কুটে, মশলা বেটে সরসীপিসি সেই চচ্চড়ি রাঁধলেন, মাছের কাঁটার সঙ্গে কচুর লতি, মিষ্টি কুমড়ো আর বরবটি দিয়ে। এখনও তার স্বাদ জিবে লেগে আছে।

সরসীপিসি যখন রান্না করছেন, কাঠের উনুনের গনগনে আঁচে তাঁর মুখটা লাল হয়ে উঠেছিল, ঘামের বিন্দুতে ভরে গিয়েছিল। হঠাৎ দেখি ঠাকুমা একটা ভিজে গামছা নিয়ে মুখটা মুছিয়ে একটা লণ্ঠন তুলে মুখটা খুব ভালো করে নিরীক্ষণ করলেন। অবিবাহিতা কুমারী মেয়ে সেই যে নস্যির কৌটোর আঘাত লেগেছিল, কোথাও খুঁত হয়ে গেল নাকি?

এই ভাবে দিন চলে গেল, মাস, বৎসর। এখন মনে হয় যেন যুগের পর যুগ।

দাদা একাই যে নস্যির কৌটো ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল তা নয়। অনেকেই নস্যি নেওয়া ছেড়ে দিল। সদর হাসপাতালের বড় ডাক্তার মেজর মফিজুল্লা সাহেব নিজেই নাকে নস্যি নিয়ে ক্যানসার হয়ে মারা গেলেন। নস্যির কুমরমা চলে গেল। অনেকে টেক্কা বিড়ি খাওয়া আরম্ভ করলেন, নীল সুতো দিয়ে বাঁধা ছোট ছোট কড়া বিড়ি। পয়সাওলা কেউ কেউ কাঁচি সিগারেট ধরলেন।

নস্যির যুগ শেষ।

কিন্তু আমার গল্প এখনও একটু বাকি আছে। আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার সঙ্গে জড়িত ঘটনাটা।

আমাদের ওই ছোট শহরেও মেয়েদের একটা আলাদা কলেজ ছিল! সেই কাদম্বিনী গার্লস কলেজ থেকে সরসীপিসি সদ্য আই-এ পরীক্ষা দিয়েছে। অল্প কয়েকদিন পরেই আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা।

পরীক্ষার অল্পদিন আগে বুঝতে পারলাম পড়াশুনো যা হয়েছে ঠিক আছে, কিন্তু পরীক্ষার আগে একবার ভালোভাবে ঝালাই করে নিতে না পারলে সুবিধে হবে না। তবে সে জন্যে এখন যা সময় আছে তাতে রাত জাগা দরকার। কিন্তু চিরকালই আমি খুব ঘুমকাতুরে, সন্ধে সাড়ে আটটা বাজতে না বাজতে আমার চোখ ঘুমে বুজে আসে।

সরসীপিসির কাছে গেলাম। এক নিমেষে এই সমস্যার সমাধান করে দিলেন তিনি। বললেন, "তুই মণ্টুদার দোকানে চলে যা, দু পয়সার নস্যি কিনে নিয়ে আয়। এক টিপ নস্যি নাকে দিলে সারারাত ঘুম আসবে না।"

pathagar.net

আমি কিঞ্চিৎ সন্দেহ ও সংস্কারাচ্ছন্ন চোখে তাকাতে সরসীপিসি বললেন, "কোনও দোষ হবে না। আমিও তো বাবার ডিবে থেকে পরীক্ষার আগে নস্যি নিয়ে রাত জাগি।"

আমি তখন একটা নতুন অসুবিধের কথা বললাম, "নস্যি রাখার কৌটো তো আমার নেই।" সরসীপিসি কি ভেবে একটু ঠোঁট টিপে হেসে বললেন, "আমার কাছে একটা কৌটো আছে। সেটায় তোর হয়ে যাবে।"

এই বলে সরসীপিসি তাঁর পড়ার টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা কৌটো বার করে দিলেন। দাদার ছুড়ে মারা সেই গ্রামাফোন পিনের চৌকো কৌটোটা।

একটু পরে কৌটোটা নিয়ে কাছারির মোড়ে মণ্টুদার দোকানে গেলাম নস্যি কিনতে। নস্যির তখন বেশি বিক্রিবাটা নেই। কৌটোর নীচে সামান্য তলানি পড়ে আছে। মণ্টুদা বললেন, "দু পয়সার নস্যি হবে না। তুমি এখন এটুকু দিয়ে কাজ চালাও। দুয়েকদিন পরে দোকানে নস্যি এলে পরে এসে দু-পয়সার নস্যি নিয়ে যেয়ো।"

সেই চৌকো কৌটোয় নস্যিটুকু পুরে বাড়ি চলে এলাম। কিন্তু নস্যি আমার নাকে দেয়া হয়নি। হাতের তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যে এক টিপ নস্যি ধরে রাখলেই যথেষ্ট, এর চেয়ে বেশি আমার লাগে না। নাকে দেওয়ার দরকার নেই।

ওই তলানি নস্যটুকুতেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা পার হয়ে গেল। মণ্টুদার দোকান থেকে আর দু পয়সার নস্যি নিয়ে আসার দরকার হল না।

তারপর ম্যাট্রিক পাস করে ছোট শহরের থেকে মহানগরে চলে এলাম। সেই চৌকো কৌটোর তলায় সামান্য এক ফোঁটা ঝাঁঝ চলে যাওয়া, বিবর্ণ হয়ে যাওয়া নস্যি। আজও কৌটোটা হাতে নিলেই আমাব হয়ে যায়। নাক পর্যন্ত নস্যি পৌঁছনোর দরকার পড়ে না। ইন্টারমিডিয়েট, বি এ, এম এ, চাকরির পরীক্ষা ওই একই নস্যি ভরসা করে পার হয়ে গেলাম।

তারও পরে তিরিশ চল্লিশ বছর হয়ে গেল। নস্যির কৌটোটা কিন্তু এখনও হারায়নি। একটু চেষ্টা করলেই দেরাজে না আলমারিতে খুঁজে পাব। পুরনো, দোমড়ানো কৌটোর গায়ে অস্পষ্ট হয়ে আসা কবেকার কুকুর আর চোঙার ছবি।

pathagar.net

জীবনবাবুর পায়রা

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে হিটারটা জ্বালিয়ে দু কাপ চা করতে বসলাম। চা হয়ে গেল, দাদা পাশের ঘর থেকে প্রতিদিন এর আগেই বেরিয়ে আসে, কোনো কোনো দিন একটু দেরি হয় অবশ্য, তবে এই সময়টা আমি দাদার ঘরে যাই না। দাদা মাথাটা নীচের দিকে পা দুটো উপরদিকে দিয়ে আসন করে, কোনো কারণে গেলে ঐ উল্টো মাথা রেখেই কথা বলে। এইরকম ভাবে কোনো কথাবার্তা সম্ভব নয় বলেই আমার ধারণা, ব্যাপারটা আমার মোটেই সুবিধার মনে হয় না। তাই পারতপক্ষে এই সকালের দিকে আসনের সময়টায় আমি দাদা না উঠে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করি।

কিন্তু দাদা আজ কিছুতেই আসছে না। বড় বেশি দেরি করছে, চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে সেই অপ্রীতিকর অবস্থার মুখোমুখি, ঠিক মুখোমুখি নয় মুখোপায়ে—আমার মুখ আর দাদার পা সামনাসামনি—দাদার ঘরে ঢুকলাম। এ কি, ঘর ফাঁকা! আলনায় জামাকাপড় নেই। দাদাও নেই। এরকম আগেও কয়েকবার হয়েছে। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বালিশের নীচে হাত দিলাম, হ্যাঁ একটা চিঠি রয়েছে।

"খোকন,

বাড়িব ভাড়াটিয়াদের সহিত জল, আলো এবং দোতলার দুমদাম শব্দ লইয়া তুমি যে গোলমাল করিতেছো আমি তাহা বাড়াইতে চাহি না। জীবনবাবুর অত্যাচারে গৃহত্যাগ করিলাম। ইতিপূর্বে আমি জীবনবাবুকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তিনি যেন কখনো বাদামি রঙের পায়রা না কেনেন। কাল বিকালে দেখিলাম জীবনবাবু একটি নহে একজোড়া বাদামি রঙের পায়রা খরিদ করিয়া আনিয়াছেন।

তোমার হয়তো মনে আছে, ক্লাস সেভেনে পড়িবার সময় বলরামদের একটি বাদামি রঙের পায়রা আমার ডান গালের আঁচিলটি ঠুকরাইয়া দিয়াছিল, এখনো পূর্ণিমা অমাবস্যায় আঁচিলটি টনটন করে। জীবনবাবুর অন্যান্য পায়রাগুলিকে তবু সহিয়াছিলাম, কিন্তু একই বাড়িতে দুইটি ঐরূপ কুৎসিত রঙের পায়রার সঙ্গে বসবাস আমার পক্ষে সম্ভব নহে—বুঝিতেই পারিতেছো।

আমি চলিলাম। খুঁজিবার চেষ্টা করিয়ো না, অন্যান্যবারের মতোই জব্দ হইবে। ভালোভাবে থাকিও। আমার লাল মাফলারটি শালকরের নিকট রহিয়াছে, শীতকালে ব্যবহার করিয়ো।

ইতি—

১৭ই বৈশাখ, বুধবার

আঃ দাদা"

এ রকম বছরে এক-আধবার ঘটেই। খুব ঘাবড়াবার কিছু নেই, প্রায় অভ্যাস হয়ে গেছে। কোনো না কোনো কারণে দাদা বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তারপরে একদিন একা একাই ফিরে আসে। "ফুটপাতে থাকা যায় না, দিনের বেলায় জুতো পালিশ করে সেখানে, রাত্তিরে ঘুমোলে মনে হয় সারা শরীরটা কে যেন ব্রাউন রঙের জুতোর কালি দিয়ে পালিশ করছে। ভীষণ অসুবিধে, ফুটপাতে কি থাকা যায়, ভিখিরিরা ঘুম থেকে ধাক্কা দিয়ে তুলে ভিক্ষা চায়।" ফিরে

এসে এই সব উল্টোপাল্টা কথা বলে—যেন আমরাই তাকে ফুটপাতে বসবাস করতে পাঠিয়েছিলাম।

তবু একটা চিন্তা হয়,—কোথায় গেল, কী করবে? চায়ের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এতক্ষণে নিশ্চয় জুড়িয়ে বরফ হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরে আসি। এসে যা চোখে পড়ল—গা জ্বলে যায়। সেই বাদামি রঙের পায়রা দুটো চায়ের পেয়ালা থেকে চুকচুক করে চা খাচ্ছে। মাথা গরম হয়ে গেল। দেয়াল থেকে ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেটটা তুলে ছুড়ে মারলাম। দিদিমার দেওয়া জাপানী পাম গাছের নীচে নদীতে নৌকো, পাখি এইসব আঁকা আমাদের বড় শখের কাচের পেয়ালা দুটো চুরমার হয়ে গেল। এতদিন যত্ন করে রাখা শিয়ালকোটের র‍্যাকেটটা দুখানা হয়ে গেল। রাঙা কাকা এনে দিয়েছিলো, এখন আর এসব র‍্যাকেট পাওয়া যায় না। কিন্তু পায়রা দুটোর কিছুই হয়নি। তারা নিশ্চিন্তে উড়ে গিয়ে পাশের বাড়ির কার্নিশে বসে বকম বকম করতে লাগলো।

ভয়ঙ্কর রাগ হল জীবনবাবুর ওপর। এই কালীঘাটের পুরনো বাড়িটা আমরা কেনার অনেক আগে থেকে এই বাড়ির একতলার ভাড়াটে জীবনবাবু। আমরা খালি বাড়িই চেয়েছিলাম, কিন্তু জীবনবাবু উঠলেন না। এক কথায় আমরা ভাড়াটে সুদ্ধ বাড়ি কিনলাম। এই কথাটা দাদা মাঝেমধ্যেই জীবনবাবুকে বলতো, "দেখুন, আপনাকে সুদ্ধ আমরা এই বাড়ি কিনেছি। আপনি আমাদের কেনা, আমাদের কথামতো চলবেন।" জীবনবাবু লোক খারাপ নন, কিন্তু ভীষণ খুঁতখুঁতে। কলে জল কম আসছে, ইলেকট্রিকের তার পুরানো হয়ে গেছে, ছাদে দুমদাম শব্দ হচ্ছে এইসব নানা আপত্তি। আর তার ওপরে এই পায়রা পোষা। এই বাদামি দুটো নিয়ে বোধ হয় সতেরো আঠারোটা পায়রা হলো তাঁর। কিন্তু এ নিয়ে কিছু বলবার জো নেই। দাদা একবার শায়েস্তা করার জন্যে একটা বিড়াল ধরে এনেছিলো, কিন্তু একটা গোদা পায়রা বিড়ালটাকে এমন ঠুকরে দিলো যে সেইদিন রাত্রে বিড়ালটা আমাদের কামড়ে-খামচে একাকার, রক্তা-রক্তি কাণ্ড।

সাতদিন, পনেরো দিন, একমাস গেল, দাদার কোনো পাত্তা নেই। এতদিনে ফিরে আসা উচিত ছিল। খুব চিন্তায় পড়লাম। কোথায় কী করছে, কী খাচ্ছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে দাদার ঘরে উঁকি দেই, দাদা এলো নাকি? রাস্তায় কতবার যে মনে হয় দাদা পেছন থেকে ডাকছে 'খোকন'! খবরের কাগজে অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মৃত্যু সংবাদ দেখলে বুকটা কাঁপে। তবু দাদা ফিরলো না।

এর মধ্যে একদিন সকালে একটা শুঁটকো মতন লোক, চোখ দুটো ঝকঝক করছে, মাথার চুল ন্যাড়া করা, আমার কাছে এলো। এসে বললো, "হামার নাম চুনুলাল আছে।"

লোকটাকে চিনতে পারলাম না। বললাম, "তোমার কী চাই, কী করো তুমি?"

"হামি টেরেনে মালপত্তর সরাই।"

"ট্রেনে মালপত্র সরাও! কুলির কাজ করো নাকি? আমি কুলি দিয়ে কী করবো?"

"আরে নেহি নেহি বাবু, কুলি নেহি।" লোকটা আমার অজ্ঞতাতেই বোধ হয় একটু হাসলো, তারপর বললো, "হামি এই বাবুলোক টেরেনে ঘুমিয়ে-উমিয়ে পোড়লে উসকো টেরাঙ্ক, সুটকেস এহি সব নিয়ে চোলে যাই। এই চোট্টা আছি।" চুনুলালকে একটু লজ্জিত দেখালো।

"চোট্টা! সে কী, এখানে কী?" আমি পুলিশকে প্রায় ফোন করতে যাই আর কি।

চুনুলাল বললো, "বড়বাবু হামাকে ভেজলেন।"

"বড়বাবু, কোন্ বড়বাবু?" আমি অবাক হই।

"এই চিঠ্ঠি লিজিয়ে।" কাপড়ের ময়লা গিঁট থেকে চুনুলাল একটা দুমড়ানো কাগজ বের করে দিলো ঃ "হামি আর বড়বাবু একসাথ রানাঘাট জেইলমে ছিলাম। হামার খালাস হয়ে গেলো। বড়বাবু বোললেন—এই চিঠিটা হামার ছোটা ভাইকা দে না।"

দাদার চিঠি। রানাঘাট জেল থেকে!

খোকন,

ভালই ছিলাম। জেলখানায় কেহ পায়রা প্রতিপালন করে না। চোরবাটপাড়ের ভয়ও নাই, কেন না সবাই এখানে।

অবশ্য নানা জনে নানা কথা বলে। আমাকে আড়ংঘাটা স্টেশন হইতে সন্দেহজনক গতিবিধির জন্য পুলিশ ধরিয়া রানাঘাট চালান দিয়াছে' কেহ বলিতেছে আমি গুপ্তচর, কেহ বলিতেছে খুন করিয়া পাগলা সাজিয়াছি, কেহ বা অনুমান করিতেছে পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়া আকস্মিক আঘাতে মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি যে সত্যিই পাগল, ধরা না পড়িলেও মাথার গোলমাল থাকিত, ইহা ইহাদের কিছুতেই বোঝানো যায় না। সে যাহা হউক, ভাবিয়াছিলাম সমস্ত জীবন এইখানেই কাটাইয়া দিব, কিন্তু সম্প্রতি এক অসুবিধা হইয়াছে।

এতদিন পশ্চিমদিকের সেলে ছিলাম। এক অতি দুর্দান্ত কয়েদী আসায় তাহাকে সেখানে রাখিয়া আমাকে পূর্বদিকের সাধারণ কয়েদীদের সেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। তাহাতে আপত্তির কিছু নাই, কিন্তু অসুবিধা এই যে, এইদিকে পাঁচিলের পাশে একটি তেঁতুলগাছ রহিয়াছে। তুমি নিশ্চয় জান, তেঁতুলগাছের ছায়ায় আমার ভীষণ অম্বল হয়, চোঁয়া-ঢেকুর। লাপসি খাইতে কি রকম তাহা লিখিয়া লাভ নাই কিন্তু লাপসির চোঁয়া-ঢেকুর, খোকন, কি লিখিব? তুমি জানো, জানালা দিয়া তেঁতুলগাছের ছায়া পড়িত বলিয়া আমি জ্যাঠামহাশয়কে বলিয়া শিবনাথ স্কুলে পড়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, এখন রানাঘাট জেলও ছাড়িতে হইবে।

এই পত্র টেলিগ্রাম মনে করিয়া অবিলম্বে চলিয়া আইসো।

২০শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার—

ইতি

আঃ দাদা

pathagar.net

পুনশ্চঃ পরম স্নেহাস্পদ চুনুলালকে পাঠাইলাম। তাহাকে মিষ্টি খাওয়াইয়ো।

চুনুলালকে জলটল খাইয়ে আমি তখনই ঊর্ধ্বশ্বাসে রানাঘাটের দিকে ছুটলাম। প্রথমে দাদার সঙ্গে জেলে দেখা করলাম। দাদার এতবড় দাড়ি হয়েছে!

"দাদা, এতবড় দাড়ি হয়েছে?" আমি অবাক হয়ে দাদাকে দেখতে লাগলাম।

দাদা একটু হাসলো, "খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলি বুঝি, দাড়ির কথা লিখিসনি। একমাস বাইরে বাইরে, আরে বোকা, দাড়ি হবে না! শুধু শুধু পয়সাগুলো জলে দিয়েছিস্।"

সুখের কথা, দাদা জীবনবাবু বা পায়রাগুলোর কথা বিন্দুমাত্র জিজ্ঞাসা করলো না।

ছুটলাম আদালতের দিকে। পেস্কারের সঙ্গে দেখা করে সব বললাম। তিনি বললেন, "সবই বুঝলাম, কিন্তু আদালত শুনবে কেন? পাগল প্রমাণ করতে হবে!"

"কী করে পাগল প্রমাণ করতে হয়?" এই প্রশ্নে পেস্কার যা বললেন তার সারমর্ম এই যে একটি পাগল প্রমাণ করতে গেলে অন্তত আরো পাঁচটি প্রয়োজন। আমাদের কালীঘাট হলে আমি শতাধিক পাগল যোগাড় করতে পারতাম। কিন্তু এই অচেনা রানাঘাটে পাগলই বা পাবো কোথায়, আর তারাই বা আমার অনুরোধ রাখবে কেন?

তখন আমাকে পেস্কার বললেন, "কিছু খরচ করলে অবশ্য জিনিসটা সেরে ফেলে দেয়া যায়।"

"ঠিক আছে, যা নায্য দেবো"। আমি স্বীকৃত হলাম।

দেড়টা নাগাদ দাদা খালাস হয়ে গেলো। পেস্কারের কথা ভুলেই গেছি। দেখি পেছনে পেছনে পেস্কার আসছেন।

"কি চাই?" দাদা ধমকে উঠলো।

"আজ্ঞে, মামলার খরচটা।" পেস্কার আমাকে বললেন।

"খালাস হলাম আমি, আর খরচ দেবে ও! আমি দেবো চলুন আমার সঙ্গে জেলখানায়! সেখানে আমার জিনিসপত্র টাকা-পয়সা রয়েছে। আমি দিয়ে দেবো।" দাদার রক্তবর্ণ চোখ দেখে পেস্কার আর কিছু বললেন না। আস্তে আস্তে পিছু পিছু হাঁটতে লাগলেন। জেলখানা বেশ দূর, জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর, পিচ গলছে রাস্তায়। দাদা বললো, "খোকন, তিনটে আইসক্রিম নে তো।"

পেস্কার বললেন, "আমার জন্যে নেবেন না, আমার দাঁতে ব্যথা।"

দাদা বললো, "ঠিক আছে, আমি দুটো খাবো।" তারপরে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পেস্কারকে বললো, "আইসক্রিম খেলে না। টাকাও পাবে না।"

"টাকা পাবো না মানে! এত খেটে খালাস করলাম।" পেস্কার মৃদু আপত্তি জানালেন।

"খালাস তো করলো হাকিম। আপনার কী?" দাদা গর্জে উঠলো।

"হাকিমকে তো আমিই বলে দিলাম" পেস্কার বিনীতভাবে জানালো।

"বলার কিছু ছিলো না। ভাগুন। জানেন হাকিম আমার মেসোমশায়!" দাদা একটা মিথ্যে কথা বলে।

পেস্কার গজগজ করতে করতে চলে যায়, "আমি তো জানলুম। কিন্তু হাকিম কি সেটা জানেন?"

জেলখানা থেকে দাদার মালপত্র ছাড়িয়ে বেরোলাম। বেরোবার সময় দাদা জেলারকে বললো, "চললাম। সকলেরই খালাস হয়, তোমার আর খালাস নেই। উন্নতি হলে বড় জেল, না হলে এই ছোট জেল। থাকো সারাজীবন।"

কলকাতায় দাদাকে নিয়ে এসে পৌঁছলাম। আশ্চর্য, দাদা জীবনবাবু বা তার পায়রাগুলোর ব্যাপারে কোনো কথাই বললো না। শুধু মধ্যে মধ্যে বাঁকাচোখে পায়রাগুলোকে দেখতে লাগলো।

পরদিন রবিবার। জীবনবাবু সকালের দিকে স্নানটান করে প্রত্যেক রবিবার কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে যান। জীবনবাবু যেই বেরিয়ে গেলেন দাদা মোড়ের মাথার মডার্ন স্টেশনার্সে গিয়ে এক কৌটা লাল আর এক কৌটো কালো রঙের জুতোর কালি কিনে আনলো। বুঝতে পারলাম, একটা কিছু মতলব মাথায় আছে। তারপর বারান্দায় বসে এক মুঠো চাল ছিটিয়ে দিলো। চাল দেখে আস্তে আস্তে পায়রাগুলো নেমে এলো। দাদাও

একটু একটু করে হাত বাড়িয়ে এক একটা পায়রা ধরে আর বুরুশে কালি মাখিয়ে সাদা পায়রাগুলোকে কালো রঙ আর কালো পায়রাগুলোকে লাল রঙ করে দিলো। বাদামি রঙের পায়রাদুটোকে খুব যত্ন করে কোথাও কালো কালি, কোথাও লাল কালি পালিশ করা হলো। বাধা দিয়ে কোনো লাভ নেই, আমি কিছু বললাম না।

গোটাদশেক নাগাদ জীবনবাবু কপালে সিঁদুর-টিদুর দিয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু ততক্ষণে হুলস্থূল কাণ্ড। আঠারোটা পায়রা পাগলের মতো পরস্পর মারামারি আরম্ভ করেছে।

"আমার পায়রাগুলো গেল কোথায়, এই বিশ্রি রঙের পায়রাগুলো এলো কোত্থেকে?" জীবনবাবুর কণ্ঠস্বর কী ছিলো কে জানে, হঠাৎ সেই আঠারোটা হিংস্র পায়রা সমবেতভাবে জীবনবাবুকে আক্রমণ করলো। জীবনবাবু প্রথমে ছাতার নীচে গিয়ে বসে পড়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনো সুবিধা হলো না, ঠুকরে ঠুকরে পায়রাগুলো মাংস তুলে নিলো। তখন লেপ। লেপের নিচে আশ্রয় নিলেন জীবনবাবু। সন্ধ্যার দিকে পায়রাগুলো কোথায় চলে গেল।

জীবনবাবু উচ্চবাচ্য না করে একটা ঠেলাগাড়ি ডেকে এনে মালপত্র তুলতে লাগলেন। একটি কথাও বললেন না। দাদা তখন নেমে গিয়ে বললো, "কি খবর জীবনবাবু, কোথায় যাচ্ছেন?"

"জাহান্নামে!" জীবনবাবু খেঁকিয়ে উঠলেন।

"সেটা আমরা না পাঠালে আপনি যেতে পারেন না। আপনাকে সুদ্ধ আমরা এই বাড়ি কিনেছি। আপনাকে ছাড়লে তো যাবেন!" দাদা বললো, তারপর যোগ করলো, "আচ্ছা ঠিক আছে! যাও বীর, তুমি মুক্ত।"

পরদিন সকালে খবরের কাগজ কিনতে গিয়ে হাজরার মোড়ের দক্ষিণ কোণের ল্যাম্প-পোস্টে একটি বিজ্ঞাপন নজরে পড়লো—

বিজ্ঞাপন

নির্ঝঞ্ঝাট মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের জন্য ঘরভাড়া চাই—দেয়াল বা ছাদ না থাকিলেও চলিবে। যদি কোনো পরোপকারী ভদ্রলোক ঘরের সন্ধান দিতে পারেন চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। এই ল্যাম্পপোস্টের নিচে প্রতিদিন সন্ধ্যায় আটটা হইতে নয়টা নীল জামা গায়ে দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিব, দয়া করিয়া যোগাযোগ করিবেন।

বিনীত
জীবনলাল দাস।
ঠিকানা—নাই।

জ্যাকব

সে প্রায় চল্লিশ বছর হয়ে গেল। কিন্তু আজও আমি বুঝে উঠতে পারিনি, আমরা কেন জ্যাকবকে পুষতাম।

জ্যাকব ছিল আমাদের পোষা ঘোড়া। কিন্তু সে আমাদের কোনওদিন কোনও কাজে লাগেনি। আমরা কেউ কোনওদিন তার পিঠে চড়ে কোথাও যাইনি। কোনও মালপত্রও তাকে দিয়ে কোনওদিন বহন করানো হয়নি। তবে একটা কুকুর গৃহস্থবাড়ির যে কাজে লাগে, জ্যাকব সে রকম কাজে লেগেছে। জ্যাকব যতকাল ছিল, বাড়িতে কোনওদিন চোর আসেনি। পাড়া-প্রতিবেশী, বাইরের লোকজন যারা জ্যাকবকে জানত, সবাই তাকে ভয় পেত। ভিখিরিরা রীতিমতো সমীহ করত তাকে। এমনকি মহরমের সময় নিকারিপাড়ার যে তাজিয়া এসে আমাদের বাইরের উঠোনে ঢাল-সড়কি নিয়ে 'হায় হাসান হায় হোসেন' বলে বুক চাপড়িয়ে লড়াই দেখিয়ে টাকা নিয়ে যেত, তারা পর্যন্ত আসবার ঘণ্টা দু'এক আগে লোক মারফত আমার ঠাকুর্দাকে খবর পাঠাত, যাতে বুড়ো কর্তা তারা আসার আগে জ্যাকবকে বেঁধে রাখে।

জ্যাকবকে বেঁধে রাখা অবশ্য তত সহজ ছিল না। শুধু আমার ঠাকুর্দাকে আর আজিমাকে জ্যাকব একটু ভয় পেত, আর কাউকে সে মানুষের মধ্যে গণ্য করত না।

ঠাকুর্দাকে যে জ্যাকব শুধু ভয় পেত তা নয়। সে তাঁকেই মালিক বা প্রভু বলে ভাবত। ঠাকুর্দার প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল অপরিসীম। প্রতিদিন রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে সে একবার ভিতরের বারান্দার পাশ থেকে ঘাড় উঁচু করে ঠাকুর্দার শোয়ার ঘরের মধ্যে তাকিয়ে দেখত ঠাকুর্দা ঘুমিয়ে পড়েছেন কি না। আর প্রত্যেক ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ঠাকুর্দার ঘরের কাছে একবার চিঁহি চিঁহি হ্রেষাধ্বনি করে সে চরতে বেরোত।

আর আজিমার সঙ্গে জ্যাকবের সম্পর্ক ছিল নিতান্ত স্নেহের। আজিমা আমার বাবার দূর সম্পর্কের জ্যাঠাইমা, বালবিধবা। আমার বাবাও তাঁকে যেমন দেখেছেন, আমরাও তাঁকে তেমনই দেখেছি। সাদা থান, কদমছাঁট চুল, টকটকে গায়ের রঙ। কোনওদিন তিনি যুবতী ছিলেন না, কোনওদিন তিনি বুড়িয়েও যাননি।

আজিমা যখনই রান্নাঘরের বারান্দায় তরকারি কুটতে বসতেন, জ্যাকব এসে উঠোনে দাঁড়াত। তরকারি কুটতে কুটতে আলুর খোসা, বেগুনের বোঁটা, কপির ডাঁটা যা কিছু তিনি ছুঁড়ে দিতেন জ্যাকব নির্বিচারে তাই খেয়ে নিত। একবার আজিমার ছুড়ে দেওয়া মানকচুর মাথা অন্যমনস্কভাবে চিবিয়ে জ্যাকবের মুখ তিন-চারদিন ফুলে থাকে। তবুও সে উঠোনে এসে নিঃশব্দে আজিমার তরকারি কোটার সময় দাঁড়িয়ে থাকত। আজিমা নিজে থেকেও কখনও কখনও ডাকতেন জ্যাকবকে। হয়তো আধ কড়াই ডাল বেঁচে গেছে, কিংবা হাঁড়িতে রয়েছে অনেকটা বাড়তি ভাত। কুকুরকে যেভাবে ডাকে, আজিমা সেইভাবেই 'আয় আয় চু-চু' করে জ্যাকবকে ডাকতেন। বাড়ির বৌ তো, তাই গলা উঁচু করে ডাকতে পারতেন না, একমাথা ঘোমটা দিয়ে বাইরের উঠানের দরজার কাছে গিয়ে নিচু গলায় ডাকতেন। কাছাকাছি কোথাও থাকলে সঙ্গে সঙ্গে জ্যাকব চার পায়ে ছুটে আসত।

চার পায়ে কথাটা অবশ্য ঠিক হল না। জ্যাকব একটু খোঁড়া ছিল, কোনও একটা পায়ে।

কিন্তু ঠিক কোন্ পায়ে, সেটা আমরা কখনই ধরতে পারিনি। জ্যাকব নিজেও জানত কিনা সন্দেহ। কখনও দেখতাম, জ্যাকব সামনের ডান-পায়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে, আবার কখনও হয়তো পিছনের বাঁ-পায়ে। হয়তো কাজ এড়ানোর জন্যে জ্যাকবের এটা এক ধরনের চালাকি ছিল। আবার এমনও হতে পারে, ওটা ছিল তার চলার স্টাইল। এমনিতেই আমাদের বাড়ির সবাই একটু বাঁদিকে খুঁড়িয়ে চলে। জ্যাকব হয়তো আমাদের দেখে দেখেই হাঁটার কায়দাটা রপ্ত করেছিল।

এসব অনেককাল আগেকার অল্পবয়সের কথা। জ্যাকবের সব স্মৃতি এখন আর তেমন স্পষ্ট নয়। কিন্তু দুটো ছবি এখনও পরিষ্কার চোখে ভাসছে। একটা ছবি হল, আজিমার ডাক শুনে কাছারিঘরের পিছনের কচুর ঝোপ ভেঙে খোঁড়া পায়ে জ্যাকব ছুটে আসছে। আর দ্বিতীয়টাও আজিমাকে নিয়েই। কিন্তু সে দৃশ্যে আজিমা নেই। আজিমা তখন মারা গেছেন। কিন্তু জ্যাকবের সে বোধ নেই। আজিমার মৃত্যুর অনেকদিন পরে পর্যন্ত জ্যাকব সকালবেলায় আজিমার তরকারি কোটার সেই নির্দিষ্ট সময়ে রান্নাঘরের বারান্দার সামনে এসে দাঁড়াতো।

আজিমা হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পরে বারান্দায় মাদুরে বসে পাড়া-প্রতিবেশী বৌ-ঝিদের সঙ্গে নিত্যনৈমিত্তিক গল্প করতে করতে বুকের ব্যথায় কাতর হয়ে যান। এবং অল্প পরেই মারা যান। সেদিন সন্ধ্যাতেই নদীর ঘাটে শ্মশানে তাঁকে নিয়ে গিয়ে দাহ করা হয়। বাড়ির লোকজন, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন অনেকেই শবযাত্রী হয়েছিল। সেই শববাহকের দলের সঙ্গে জ্যাকবও খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়েছিল। বাড়িতে আজিমাকে যখন উঠোনে নামানো হয়, একটু দূর থেকে মাথা উঁচু করে জ্যাকব সবকিছু ক্রিয়াকর্ম লক্ষ করতে থাকে। তারপর যখন শবযাত্রা রওনা হয়, জ্যাকব তাদের অনুসরণ করে শ্মশান পর্যন্ত আসে। সেখানে সে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। আজিমাকে চিতায় ওঠানো হল, মুখাগ্নি করা হল, অন্ধকার শ্মশানে নদীর চাতালে দাঁড়িয়ে জ্যাকব সব দেখেছে। তারপর শেষ রাতে চিতায় জল ছিটিয়ে সবাই যখন হরিধ্বনি করে ফিরে এসেছে জ্যাকবও তাদের সঙ্গে ফিরেছে, এতক্ষণ সে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, জ্যাকবের মৃত্যুবোধ ছিল না। সে বুঝতেই পারেনি কী হয়েছে। তা না হলে সে কি আর পরেরদিনই সকালে রান্নাঘরের বাবান্দার সামনে এসে দাঁড়ায়, আজিমা তরকারি নিয়ে কুটতে বসেছেন এই আশায়।

দুই

জ্যাকব প্রথমে ছিল ম্যাকেঞ্জি সাহেবের ঘোড়া। ঠিক ম্যাকেঞ্জি সাহেবের নয়। সে ছিল মিসেস ম্যাকেঞ্জি অর্থাৎ ম্যাকেঞ্জি-মেমের ঘোড়া। আমরা দেখিনি, কিন্তু বড়রা দেখেছে জ্যাকবের পিঠে চড়ে ম্যাকেঞ্জি-মেম নদীর ধারের রাস্তায় টগবগ করে ছুটছেন। শুধু মেমসাহেবই নয়, জ্যাকবও নাকি তখন এমন খোঁড়া ছিল না, রীতিমতো টগবগে ছিল।

ম্যাকেঞ্জি সাহেব ছিলেন সাহেব কোম্পানির পাটের এজেন্ট। আমাদের এলাকা ছিল পাটের জন্যে ভুবনবিখ্যাত। কলকাতা আর হাওড়ার হুগলি নদীর দুপাশের পাটকলগুলির পক্ষে কেনাবেচা করার জন্যে বহু সাহেব আমাদের অঞ্চলে যেতেন ও থাকতেন। পাটগুদামের পাশের জমিতে রীতিমতো টেকসই বাংলোবাড়ি বানিয়ে ম্যাকেঞ্জি সাহেব অবশ্য পাকাপাকি ভাবেই বসবাস করতেন আমাদের শহরে।

ম্যাকেঞ্জি সাহেবের বাংলোর হাতায় একটা মরসুমী ফুলের বাগান ছিল। শীতে সে বাগান ছেয়ে যেত জিনিয়া, ডালিয়া আর গাঁদা ফুলে। গাঁদাফুল ছিল তিন রকম। কুঁড়ি গাঁদা, সেগুলো ছোটো আকারের, কুঁড়ির মতো—মনে হতো, এখনও সম্পূর্ণ ফোটেনি। আর রক্তগাঁদা ছিল মাঝারি মাপের, তার পাপড়ি ছিল কালচে লাল রঙের। বড়, হলুদ রঙের বাগান আলো-করা গাঁদাফুল যেগুলো, সেগুলোকে বলা হত ভোলাগাঁদা।

কোন এক পাটের ব্যাপারির সঙ্গে টাকা লেনদেনের একটা বাজে মামলায় জড়িয়ে পড়ে ম্যাকেঞ্জি সাহেবের কোম্পানি। কোম্পানির তরফে ম্যাকেঞ্জি সাহেব আমার ঠাকুর্দাকে উকিল রাখেন। সেই মামলার সূত্রেই এবং পরে আরও নানা কারণে ম্যাকেঞ্জি পরিবারের সঙ্গে আমাদের বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়। খুব ছোট বয়সের কথা হলেও এখনও অল্পস্বল্প মনে আছে, সরস্বতী পুজোর সময় ঝুড়িভর্তি ডালিয়া, জিনিয়া আর গাঁদাফুল আমরা নিয়ে এসেছি ম্যাকেঞ্জি সাহেবের বাগান থেকে।

ম্যাকেঞ্জি-মেমকেও অল্প অল্প মনে আছে। বেশ কয়েকবার আমাদের বাড়িতে তিনি এসেছেন। মা-ঠাকুমাদের পক্ষে ভাঙা ও কাঁচা ইংরেজিতে আমার এক পিসি মেমসাহেবের সঙ্গে কথোপকথন চালাতেন, ঐ ইয়েস-নো-ভেরি গুড জাতীয় কথাবার্তা। তবে ম্যাকেঞ্জি-মেম চলে যাওয়ামাত্র সারা বাড়িতে গোবরজল ছেটানো হত। আর ম্যাকেঞ্জি-মেমকে চা দেওয়া হত যে-পেয়ালায় সে-পেয়ালা, রান্নাঘরে কেন, বাড়ির মধ্যেই ঢুকতে পেত না। সে-পেয়ালা থাকত কাছারি-ঘরে বইয়ের আলমারির তাকে।

যুদ্ধ লাগল। তার কিছুদিনের মধ্যেই সাহেবরা চঞ্চল হয়ে উঠল। একদিন সারা জেলায় যেখানে যত সাদা চামড়ার সাহেব ছিল, তাদের মিটিং হল জেলাসদরে সাহেবি ক্লাবে। তারপর সাহেবদের ঘর ভাঙতে শুরু করল। প্রথম রওনা হলেন মেমসাহেবরা, ছোট ছেলেপিলে নিয়ে দেশের দিকে। আবার কেউ নার্স হয়ে বা অন্য কোনও কাজে যুদ্ধে গেলেন।

আগে গেলেন ম্যাকেঞ্জি-মেম। তারপর একদিন ম্যাকেঞ্জি সাহেবকেও তল্পিতল্পা গুটিয়ে যুদ্ধে যেতে হল। তালাবন্ধ হয়ে পড়ে রইল তাঁর বাংলো, আর অযত্নে নষ্ট হয়ে গেল ফুলের বাগান। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যেক বছর শীতের সময় একা একাই কিছু ফুল ফুটতো সে বাগানে। অনেকদিন পর্যন্ত আমরা দেখেছি।

ম্যাকেঞ্জি সাহেব যুদ্ধে যাওয়ার সময় অনেক জিনিসপত্র লোকজনদের বিলিয়ে দিলেন আর সেই সঙ্গে জ্যাকবকে দিয়ে গেলেন আমার ঠাকুর্দার হাতে। যাওয়ার দিন সকালবেলা জ্যাকবকে লাগাম লাগিয়ে আমাদের বাড়িতে হাঁটিয়ে নিয়ে এল ম্যাকেঞ্জি সাহেবের সহিস। এসে জ্যাকবকে কাছারিঘরের বারান্দায় খুঁটিতে বেঁধে সহিস ঠাকুর্দাকে বলল, "ম্যাকেঞ্জি সাহেব ভেজ দিয়া।"

ম্যাকেঞ্জি সাহেব বোধহয় ঠাকুর্দাকে এই উপহারের কথা আগেই বলেছিলেন, ঠাকুর্দা সহিসকে বললেন, "ঠিক আছে, রেখে যাও।" ঠাকুর্দা কাছারিঘরে মক্কেলদের নথিপত্র দেখছিলেন, একবার উঠে এসে জ্যাকবকে দেখে গেলেন।

কিন্তু সারা বাড়িতে তখন ভীষণ উত্তেজনা। আমাদের বাড়িতে কখনও কখনও গ্রামাঞ্চল থেকে কোনও কোনও মক্কেল ঘোড়ায় চড়ে আসত। চৈত্র মাসে ভাগচাষীরা ঘোড়ার পিঠে করে ফসলের ভাগ দিতে আসত। কিন্তু এ আমাদের একেবারে নিজেদের ঘোড়া।

একটু পরে ঠাকুর্দা আর বাবা আদালতে যাওয়ার আগেই ম্যাকেঞ্জি সাহেব বিদায় নিতে এলেন। তিনি বললেন যে, "এ খুব ভাল ঘোড়া। ভদ্র, শিক্ষিত। এর নাম জ্যাকব। কখনও কখনও খোঁড়ায় বটে, কিন্তু যখন খোঁড়ায় না, তখন খুব ছোটে। আমার মেম সাহেবের খুব প্রিয় ঘোড়া ছিল এটা। খুব বুদ্ধি এ ঘোড়ার।"

ম্যাকেঞ্জি সাহেব জ্যাকবকে রেখে চলে গেলেন। এর পরে তাঁর আর কোনও খোঁজ আমরা পাইনি। কিন্তু জ্যাকব আমাদের বাড়িতে রয়ে গেল। প্রথম প্রথম কিছুদিন নদীর ধারে তার পুরনো মনিবের বন্ধ বাড়িতে গিয়ে জ্যাকব সময়ে অসময়ে একটা পাক দিয়ে আসত। শেষে বোধহয় বুঝতে পেরেছিল ও বাড়িতে আর কেউ নেই, তখন আর যেত না। তবে বহুদিন পর্যন্ত নদীর ধারে গিয়ে, সাহেবদের বাংলো বাড়িটা যেখানে ছিল, একেক সময়ে থমকে তাকিয়ে দেখতো জ্যাকব, আর কী যেন ভাবত।

জ্যাকব যেদিন প্রথম আমাদের বাড়িতে এল, বাড়ির প্রায় প্রত্যেকেই যেমন খুবই উত্তেজিত হয়েছিল চতুষ্পদ বাহনের আগমনে, তেমনিই আমিও বেশ উৎফুল্ল হয়েছিলাম ঘোড়ায় চড়তে পাব এই আশায়। মক্কেলদের ঘোড়ার পিঠে চুরি করে চড়ে ঘোড়ায় চড়ার স্বাদ আগেই পেয়েছিলাম। এবার নিজেদেরই ঘোড়া হওয়ায় ভালো করে ঘোড়-সওয়ার হওয়ার সখ হল।

আমার সে শখ কিন্তু পূর্ণ হয়নি। আমাদের বাড়ির ধর্মকর্ম, ইহকাল-পরকাল সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতেন পটলমামা। তিনি সম্পর্কে বাবার মামা ছিলেন, নাকি মার মামা ছিলেন, নাকি কাকিমা-জেঠিমাদের কারও মামা ছিলেন, এতদিন পরে তা আর বলতে পারব না। এখনও হতে পারে যে, তিনি ঠাকুর্দা বা ঠাকুমার মামা ছিলেন। ঠাকুর্দা আর আজিমা তাঁকে নাম ধরে ডাকতেন। ঠাকুমা তাঁকে দুচোখে দেখতে পারতেন না। কোনও এক বা একাধিক অজ্ঞাত কারণে ঠাকুমা তাঁর সঙ্গে একদম কথা বলতেন না। এতদিন পরে এসব কথা লিখতে গিয়ে এই পরিণত বয়েসে এখন মনে হচ্ছে, পটলমামা সম্ভবত ঠাকুমারই দূর-সম্পর্কের কোনও অপোগণ্ড ভাই ছিলেন। সে যা হোক, এছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত মানুষ আছে বাড়ির লোক, পাড়ার লোক, রাস্তার লোক, বাজারের লোক, সবাই তাঁকে পটলমামা বলত।

তা বলুক, পটলমামা এসব নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তিনি এ সমস্তের বহু ঊর্ধ্বে ছিলেন। তিনি বহুবিধ শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ আরোপ করে, যার মধ্যে অনেকগুলিই ছিল তাঁর মনগড়া, আমাদের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতেন। তাঁর কথা যে সবাই সবসময় মান্য করত, তা অবশ্য নয়। কিন্তু তার একটা সুবিধে ছিল এই যে, তিনি পাঁজি দেখতে জানতেন, কখন গ্রহণ ছাড়বে, কখন লক্ষ্মীপুজো আরম্ভ করতে হবে, এসব বিধান তিনিই দিতেন। লাউ কিংবা মোচা খাওয়া সম্বন্ধেও তাঁর কঠোর সংস্কার ছিল।

পটলমামা জ্যাকবের বাড়িতে আসা ভালোভাবে নেননি। আমাদের বাড়ি ছিল দক্ষিণমুখী, প্রথমেই বললেন, "দক্ষিণমুখী বাড়িতে ঘোড়া পুষতে নেই। ঠাকুরপুরের ছোট তরফ এই করেই নির্বংশ হয়েছিল।" আজিমার ধমক খেয়ে পটলমামা, অবশ্য পরে স্বীকার করেন যে, ঠাকুরপুরের ছোট তরফের বাড়ি দক্ষিণমুখী ছিল না, সেটা ছিল পূর্বমুখী। আর ঠিক ঘোড়ার জন্যে নয়, তারা নির্বংশ হয়েছিল শনিবারের বারবেলায় বেড়াল মারার জন্যে।

ঘোড়া পোষা সম্পর্কে পটলমামার নিষেধ খাটলো না বটে, কিন্তু তিনি একটা মারাত্মক কথা বললেন তিনি বললেন যে, ম্যাকেঞ্জি মেমের গোপনীয়, দূষিত অসুখ ছিল। সেই পাপিষ্ঠা,

ম্লেচ্ছা রমণী এই ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘোড়াটাকেও দূষিত করেছে। এর পিঠে যে চড়বে, তারও ঐ সব খারাপ অসুখ হবে। প্রথমে অধমাঙ্গে, পরে উত্তমাঙ্গে সারা গায়ে দগদগে ঘা হয়ে এ ঘোড়ার সওয়ার মারা পড়বে।

এই ভয়াবহ ঘোষণার ফল ফলেছিল। তার একটা কারণ ছিল এই যে, লক্ষ্য করে দেখা গিয়েছিল জ্যাকবের পিঠে একটু ঘায়ের মত কী যেন আছে। ফলে কেউই আর জ্যাকবের পিঠে উঠতে সাহস করেনি। শুধু দু-একজন সেই আমরা যারা লুকিয়ে চুরিয়ে এক-আধবার প্রথমদিকে জ্যাকবের পিঠে উঠেছি, সারাজীবন দুশ্চিন্তায় কাটালাম এই বুঝি শরীর দিয়ে চাকা চাকা দূষিত ঘা বেরোল। তাহলে কি আর কাউকে, এমন কি ডাক্তারকে বোঝানো সম্ভবপর হত যে, ছোটবেলায় ঘোড়ার পিঠে ওঠায় আজ গায়ে এই ঘা বেরিয়েছে।

জ্যাকব কিন্তু রয়ে গেল আমাদের বাড়িতে। শীত শেষ হতেই তার পিঠ বাদামি লোমে ছেয়ে গেল, ঘায়ের চিহ্নও আর রইল না। পরে আমরা দেখেছিলাম, প্রত্যেকবারই শীতের শুরুতে অনেক লোম ঝরে গিয়ে একটা ঘিয়ে-ভাজা-ভাব আসে জ্যাকবের। শীত কেটে গেলেই সেটা চলে যায়।

জ্যাকব আমাদের বাড়িতে এসেছিল অঘ্রাণের মাঝামাঝি। সে বছর পুরো শীতকালটা সে রান্নাঘরের পাশে যজ্ঞডুমুর গাছের তলাটা তার আস্তাবল হিসেবে ব্যবহার করেছিল। শুধু একদিন রাতে খুব বৃষ্টি আসায় সে রান্নাঘরের বারান্দায় উঠে আসে। রান্নাঘরে দাসী শুতো। পরেরদিন খুব ভোরবেলায় দাসী উঠোন ঝাঁট দিতে রান্নাঘরের দরজা খুলে বেরোতে গিয়ে দেখে জ্যাকব দাঁড়িয়ে। তার সে কী আর্ত চিৎকার! পুরো বাড়ির লোক শেষরাত্রির সুখতন্দ্রা ফেলে সে-চিৎকার শুনে ঘর খুলে বেরিয়ে পড়েছিল। কাছারিঘরে দু-একজন মক্কেল প্রয়োজনে রাত্রিবাস করত। সেদিন রাহাজানির মামলায় দুজন সদ্য জামিনপ্রাপ্ত আসামীও ছিল। তারা দাসীর সেই আর্তনাদ শুনে খুব শঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং আশঙ্কা করে যে, হঠাৎ যদি থানা-পুলিশ হয়, আবার তারা বিপদে পড়বে।

দাসীর চেঁচামেচি শুনে মৃদুমন্দ চালে জ্যাকব রান্নাঘরের বারান্দা থেকে নেমে গিয়েছিল। সে বুঝতে পেরেছিল যে, রান্নাঘরের বারান্দায় তার ওঠা এদের পছন্দ নয়। এর পরে জ্যাকব আর রান্নাঘরের বারান্দায় ওঠেনি, ঝড়বৃষ্টি হলে কাছারিঘরের বারান্দায় গিয়ে উঠত। বাকি অন্য সময় সে নিজের মনে বাড়ির মধ্যে এবং বাড়ির বাইরে নানা জায়গায় আপনমনে ঘুরে বেড়াত। শুধু সন্ধ্যার আগে আগে বাড়ি ফিরে এসে যজ্ঞডুমুর গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোত, তারপর ভোর হওয়া মাত্র নিজেই বেরিয়ে পড়ত, বাড়ির সামনের মাঠে বা রাস্তার ধারে ঘুরে ঘুরে ঘাস খেতো।

যজ্ঞডুমুর গাছের তলাটা খুব প্রিয় ছিল জ্যাকবের। ওখান থেকে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাড়ির ভিতরে নজর রাখত। বাড়ির মধ্যে কুকুর, বিড়াল কাউকে সহ্য করতে পারত না জ্যাকব। এমন কি ভিখিরি, বাউল, মুসকিল আসান দেখলেও তাড়া করে যেত। গাছতলায় দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার পর থেকে চোখ বুজে কান খাড়া করে ঘুমুত সে। রাতের খাওয়া হয়ে গেলে এঁটোকাঁটা খেতে দু-একটা আটপোষা কুকুর ছুটে আসত, তাদের সঙ্গে সঙ্গে তাড়া করে যেত জ্যাকব। আমাদের বাড়ির সামনের পুকুরে একপাল জংলি রাজহাঁস কবে কোথা থেকে এসেছিল কে জানে। সারাদিন পাড়ার মধ্যে চড়ে বেড়াত আর সূর্যাস্তের আগেই

মধ্যপুকুরে গিয়ে পিঠে ঠোঁট গুঁজে ঘুমোত। বনবেড়াল আর শেয়ালের থাবা থেকে বাঁচবার জন্যে ওরা এটা করত, কারণ এসব জন্তু জলে সাঁতরিয়ে গিয়ে পুকুরের মাঝখানে ওদের আক্রমণ করতে পারে না। এই হাঁসগুলো রাতের বেলায় শত্রুদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিল, কিন্তু দিনের বেলায় পাড়ার মধ্যে ওদের যেখানে দেখত নৃশংসভাবে জ্যাকব তাড়া করে যেত। আমাদের বাড়িতে একদা হাঁসদের খুব সমাদর ছিল, আজিমা ওদের প্রত্যেকের নামকরণ করেছিলেন এবং প্রত্যেককে আলাদা করে চিনতেন, একেকদিন বলতেন, "সবাই এল, রাণী আর বাণী আজ এল না কেন?" যে কোনও কারণেই হোক, খুব সম্ভব আজিমার প্রতি শ্রদ্ধাবশত—পাড়ার ভিতরে রাজহাসদের সঙ্গে যত খারাপ ব্যবহারই করুক, আমাদের বাড়িতে ঢুকলে জ্যাকব তাদের তাড়া করে যেত না, শুধু কটমট করে তাকাত।

আজিমা প্রত্যেকদিন দুপুরবেলা এক বাটি লাল চালের ভাতের ফ্যান দিয়ে 'চই চই' করে ডেকে হাঁসদের খাওয়াতেন। 'চই চই' করামাত্র জ্যাকবও ছুটে আসত, খুব রাগের সঙ্গে সে দেখত রাজহাঁসদের পানভোজন। আজিমা জ্যাকবকে বলতেন, "ওরা গেলে তুই খাবি।" জ্যাকব বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকত।

তিন

জ্যাকবের জন্যে আমাদের তেমন কোনও খরচ ছিল না। কোনওদিন তার জন্যে কোনও আস্তাবল তৈরি করে দেওয়া হয়নি। তার জন্যে আলাদা কোনো খাবারের বন্দোবস্তও করা হয়নি।

জ্যাকব নিজের মনে চরে বেড়াত। বাড়ির মধ্যে, পাড়ার মধ্যে অনেক সময় বেশ দূরে নদীর ধারে বা ইস্কুলের মাঠেও ঘাস খেতে যেত। একবার ইস্কুলের বোর্ডিংয়ের সামনের ফুলের বাগানে জ্যাকব ঢুকে পড়ে। বোধহয় গেটটা খোলা ছিল, সেই সুযোগে জ্যাকব ভেতরে যায়। বোর্ডিংয়ের ছেলেরা তাকে খোঁয়াড়ে দেয়।

সেদিন সন্ধ্যা পার হয়ে গেলেও জ্যাকব যখন বাড়ি ফিরল না, আজিমা ঠাকুর্দাকে জানালেন যে, জ্যাকব আসেনি। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যার আগে বাড়ি চলে আসে, আজ কী হল? একটু পরে বাজার থেকে ফেরার পথে নতুন মুহুরিবাবু খবর আনলেন যে, জ্যাকবকে ইস্কুলের ছেলেরা ধরে খোঁয়াড়ে দিয়েছে। তখনই খোঁয়াড়ে গিয়ে ছয় আনা পয়সা দিয়ে জ্যাকবকে ছাড়িয়ে আনা হল।

জ্যাকবের জন্যে একবার এই ছয় আনা খরচ হয়েছিল। আরেকবার কোথায় যে তার-কাঁটায় না ভাঙা টিনের বেড়ায় সারা শরীর কেটে, রক্তারক্তি করে জ্যাকব বাড়ি এসেছিল। সেবার দু'টাকা ভিজিট দিয়ে সরকারি পশু হাসপাতাল থেকে ডাক্তার ডেকে এনে জ্যাকবের চিকিৎসা করা হয়।

খুব রোদ্দুর হলে জ্যাকব আমাদের দালানের উত্তর দিকের ছায়ায় আমগাছের নীচে গিয়ে থাকত। কিন্তু এখান থেকে পুরো বাড়িটা নজর রাখা যেত না। তাই অন্য কোনও অসুবিধা না থাকলে সে যজ্ঞডুমুরতলাই পছন্দ করত, নেহাত ঝড়বৃষ্টি হলে কাছারিঘরের বারান্দায় আশ্রয় নিত।

জ্যাকব কী করে যেন মক্কেলদের দেখলে বুঝতে পারত। সে তাদের কিছু বলত না।

ডাকপিওন এবং খবরের কাগজওয়ালাকেও সে চিনে ফেলেছিল। এর বাইরে বাড়ির লোক ছাড়া অন্য কাউকে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেখলে সে তাড়া করে যেত। তার বিশেষ রাগ ছিল গোয়ালা, কলু এই জাতীয় লোকদের ওপরে, যারা মাথায় কিংবা কাঁধে বা বাঁকে করে কিছু নিয়ে আসত। নাক ফুলিয়ে, গরম নিঃশ্বাসের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে দৌড়ে জ্যাকব তাড়া করে যেত। তার সেই হিংস্র মূর্তি যে দেখত, তারই বুকের রক্ত হিম হয়ে যেত।

জ্যাকব অনেক সময় আমাদের সঙ্গে ইস্কুলে যেত। আমরা ক্লাসে থাকতাম, জ্যাকব মাঠে ঘুরে বেড়াত বা রাস্তার ধারের ঘাস খেত। তবে খোঁয়াড়ে বন্দী হওয়ার ঘটনার পর আর সে ইস্কুলের দিকে যায়নি।

কোনও কোনও দিন বেশি মক্কেলের ভিড় থাকলে সেই মক্কেলদের ভিড়ের পিছনে বাবা ও ঠাকুর্দার সঙ্গে জ্যাকবও আদালতে যেত। আদালতের লম্বা বারান্দায় জ্যাকব উঠে খটখট করে হাঁটত। পেয়াদা-পেশকাররা তাকে অনেক সময় বারান্দা থেকে জোর করে নামিয়ে দিত আদালতের কাজে ব্যাঘাত হবে বলে।

বাড়ির মধ্যে এবং বাড়ির কাছাকাছি জ্যাকবের যে অখণ্ড প্রতাপ ছিল, বাইরে কিন্তু তা ছিল না, এসব ক্ষেত্রে সে যথাসাধ্য নরম হয়েই থাকত।

জ্যাকবের সব কথা বলা যাবে না, শুধু জ্যাকবের একটা খারাপ দোষের কথা না লিখলে এ উপাখ্যান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

জ্যাকবের চরিত্রদোষ ছিল। তার কাঁধের ঘা যে কোনও প্রাকৃতিক কারণেই হোক, তার একটু ছুঁকছুঁক বাতিক ছিল।

ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক। কোনও মাদি ঘোড়ার প্রতি কোনও দুর্বলতা তার কখনও দেখা যায়নি। কোনও ঘোড়ার প্রতিই তার কোনও কৌতূহল ছিল না। কিন্তু মহিলাদের প্রতি তার ছিল অপরিসীম আগ্রহ। পাড়ার পুকুরে মেয়েদের স্নানের ঘাটের পাশে একটা মানকচুর ঝোপ ছিল। মশা আর মাছির অত্যাচার সহ্য করে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতো সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। লোলুপ নয়নে স্নানরতা রমণীদের পর্যবেক্ষণ করত। তার সেই কামাতুর দৃষ্টি বহু রমণীই লক্ষ করেছিলেন, তাঁরা স্নানের ঘাট থেকে উঠে ভিজে কাপড়ে বাড়ির পথে যেতে ঘোড়াটাকে কটাক্ষ করে যেতেন, "কেমন ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে দেখছে! বদমাইশ ঘোড়া!"

এ রকম গালাগাল শুনলে সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নামিয়ে মাথা সরিয়ে নিত জ্যাকব। অনেক সময় গভীর রাতেও নাকি পিশাচর হয়ে লোকের বাড়ির খোলা জানালা দিয়ে জ্যাকব মাথা গলাতো। এ ধরনের নালিশও কয়েকবার আমাদের কাছে এসেছে।

সবচেয়ে মারাত্মক হল, সেবার যখন কালীবাড়িতে হরি সংকীর্তন হল। এক সুন্দরী মাঝবয়সী বোষ্টমী মধুর গলায় কীর্তন গেয়ে আমাদের শহর মাত করে দিয়েছিল। বড় বড় ডাক্তার-উকিল অনেকেই তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। জ্যাকবও দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় অনেক মানুষের ভিড়ে কালীবাড়ির চাতালে দাঁড়িয়ে জ্যাকবও মুগ্ধ হয়ে বৈষ্ণবীর গান শুনত।

অবশেষে সঙ্কীর্তন পালা শেষ হওয়ার পরের দিন যখন বোষ্টমী ডুলিতে উঠে স্বগ্রামের দিকে রওনা হল, সেই ডুলির পিছুপিছু খোঁড়াপায়ে জ্যাকবকেও যেতে দেখা গেল।

আমরা খবর পেলাম ঘণ্টাখানেক পরে। বাড়ির বয়স্ক পুরুষমানুষের বাবা-ঠাকুর্দা,

মুহুরিবাবুরা তখন আদালতে চলে গেছে। বেলা প্রায় এগারোটা বাজে। আমি আর আমার দাদা দুজনে দুটো সাইকেল নিয়ে ছুটলাম বোষ্টমীর বাড়ির পথে। প্রায় আধঘণ্টা পরে জ্যাকবকে ধরতে পারলাম। আমাদের দেখে সে কেমন হকচকিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে বাড়ির দিকে ফিরে এল।

চার

ভালো-মন্দয়, সুখে-দুঃখে জ্যাকব আমাদের বাড়িতে অনেকদিন রয়ে গেল।

এর মধ্যে কিসে যে কী হয়ে গেল, কেউ কিছু ভাল করে বুঝবার আগেই জায়গাটা পাকিস্তান হয়ে গেল! চৌদ্দপুরুষের ভিটেয় আমরা পরগাছা হয়ে গেলাম। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, মন্বন্তরও আর নেই। চারদিক বেশ সুস্থির হয়ে এসেছে। এর মধ্যে শুরু হল হানাহানি, মারামারি, গোলমাল! আগুনের আঁচ আমাদের সেই ছোট শহরেও গিয়ে লাগল।

তখন ঠাকুর্দা মারা গেছেন। আজিমাও অনেকদিন বেঁচে নেই। বাবাই সংসারের কর্তা। গোলমালের মধ্যে বাবা দিনসাতেক নানা জায়গায় ঘুরে একদিন ফিরে এলেন। এসে বললেন, "সব দেখেশুনে এলাম। ওদিকেই প্র্যাকটিস করব। বাড়ি ঠিক করে এসেছি। খুব ছোট। কী আর করা যাবে? এখানে থাকা যাবে না।"

ঠিক হল, প্রথমে দাদা আর পটলমামা যাবে। তারপর ধীরে ধীরে সবকিছু গুছিয়ে-গাছিয়ে আমরা পরে যাব। এর মধ্যে যা কিছু সম্ভব বিক্রিবাট্টা করে বাবা কিছু অর্থ সংগ্রহ করে নেবেন।

এসব অবশ্য হয়নি। কিছুই বিক্রিবাট্টা করা হয়নি। দেশও আমরা পুরোপুরি ছেড়ে আসিনি।

কিন্তু সে অন্য গল্প। এখন জ্যাকবের গল্পটা শেষ করি।

পাকিস্তান হওয়া মাত্র পাসপোর্ট ভিসা চালু হল না বটে, কিন্তু সীমান্তে চৌকি বসলো। সীমান্তের দুই পারে দুই দেশের চৌকি, সেখানে কাস্টমস আর পুলিশের ছাউনি।

আমাদের বাড়ি থেকে সীমান্ত খুব দূরে নয়। বাবা একদিন পটলমামাকে নিয়ে ওপারে নতুন ঠিক-করা-বাড়ি দেখিয়ে আনলেন। ফেরার পথে সীমান্তচৌকির পুলিশ-ছাউনিতে আনসারবাহিনীর একজন চেনা লোক বাবাকে বলল, "উকিল সাহেব, খুব বেশি এপার-ওপার করছেন!" বাবা এ কথায় কিছু মনে করলেন না, কিন্তু লোকটা আগে যখন আমাদের শহরে একটা গুড়ের গোলায় কাজ করত তখন বাবাকে 'উকিলবাবু' বলত, এখন কেন 'উকিলসাহেব' বলল, এতে বাবার মনে খুব খটকা লাগল।

সেই দুর্দিনের যুগে মানুষের মনে এরকম কত খট্‌কা লেগেছিল। তার কিছু কিছু এখনও ভাঙেনি। সে কথা থাক, বাড়িতে ফিরে এসে ঠিক হল, পটলমামা আর দাদা দুজনে দুটো সাইকেলে চড়ে ইন্ডিয়ায় যাবে। দুটো সাইকেল ওপারে আমাদের নিজের দেশে পৌঁছে যাবে, এটা কম কথা নয়। এই সময় পটলমামা বললেন, "জ্যাকবকেও নিয়ে যাই। ঘোড়াটা সারাজীবন কোনও কাজ করল না। ওর পিঠে চড়িয়ে কয়েকটা বাক্স-বিছানা ইন্ডিয়ায় নিয়ে যাব।"

পটলমামা প্রথম থেকেই জ্যাকবকে পছন্দ করতেন না, এবার ওঁর এই পরামর্শ শুনে বাবা চটে গেলেন, বললেন, "জ্যাকব এই বুড়ো বয়েসে মাল বইতে যাবে কোন দুঃখে? তবে তোমাদের সঙ্গে জ্যাকবও যাক, পথে তোমাদের দিকে নজর রাখবে। আর ইন্ডিয়াতে গিয়েও নতুন বাসাটা পাহারা দিয়ে রক্ষা করতে পারবে।"

একদিন সুপ্রভাতে দুটো সাইকেলে দাদা আর পটলমামা, সেই সঙ্গে পাশে জ্যাকব, এই ত্রয়ী ইন্ডিয়ায় রওনা হল। অনেকদিন পরে সেই লাগামটা—যেটা পরে জ্যাকব আমাদের বাড়িতে প্রথম এসেছিল, সেটা খুঁজে বার করে জ্যাকবকে পরানো হল। রওনা হওয়ার আগে সকলের সঙ্গে জ্যাকবও কালীবাড়িতে প্রণাম করতে গেল।

প্রথমে পটলমামা সাইকেলে, তার পিছনে দাদা, তার ডানহাতে সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরা বাঁহাতে জ্যাকবের লাগাম। কিন্তু লাগাম দরকার হল না। জ্যাকব কী বুঝেছিল কে জানে, রওনা হওয়া মাত্র সে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। মা বললেন, 'জ্যাকব বোধহয় যেতে চাইছে না। ওর লাগামটা খুলে দাও।'

লাগাম খুলে দেওয়ার পর দেখা গেল জ্যাকবের যেতে কোনও আপত্তি নেই, তার যা কিছু আপত্তি সেই লাগামে। একটু পরে দাদা আর পটলমামা আবার যেই রওনা হল, জ্যাকবও সেই সাইকেল দুটির সঙ্গে ছুটতে লাগল।

কিন্তু জ্যাকব ইন্ডিয়ায় পৌঁছতে পারেনি। সেই যে আনসার বাবাকে বলেছিল 'উকিল সাহেব', সে দাদা আর পটলমামার সাইকেল দুটো আটকে দিল আর জ্যাকবকে দেখে বলল, "এই পাট কোম্পানির ঘোড়াটা আপনারা চুরি করে ইন্ডিয়ায় নিয়ে যাচ্ছেন? এটা নেওয়া যাবে না।"

পটলমামা এত সামান্য কারণে দমবার লোক নন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তের ওপারে ইন্ডিয়ার সরকারি রিফিউজি ক্যাম্পে চলে গেলেন, সেখানে মাত্র দু'টাকা ব্যয়ে একটা রিফিউজি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করলেন জ্যাকবের নামে। কিন্তু তাতেও কোন কাজ হল না। আনসার সাহেব জ্যাকবের রিফিউজি সার্টিফিকেট দেখে রেগে কুচি কুচি করে সেই সার্টিফিকেটের কাগজটা ছিঁড়ে ফেললেন।

কী আর করা যাবে, কিছুই করার ছিল না তখন। দাদা আর পটলমামা সাইকেল দুটো খুইয়ে ওপারে চলে গেল, জ্যাকব ওখানেই থেকে গেল। দাদা নাকি একবার বলেছিল, "জ্যাকবকে বাড়িতে গিয়ে রেখে আসি।" পটলমামা বলেছিলেন, "সে আরও হাঙ্গামা হবে। আর জ্যাকব নিজে নিজেই পথ চিনে বাড়ি ফিরতে পারবে। ওকে কে আটকাবে?"

কেউ আটকায়নি হয়তো, কিন্তু জ্যাকব আর বাড়ি ফেরেনি। আন্তর্জাতিক সীমান্ত চৌকির তার-কাঁটা বেড়ার পাশে সে আপনমনে ঘুরে বেড়াত, আমরা এরপরে বহুবার যাতায়াতের পথে তাকে দেখেছি। জ্যাকবও আমাদের দেখতে পেয়েছে, দেখে এগিয়ে এসেছে কিন্তু আর বাড়ি ফিরে যায়নি, শুধু আমাদের আসা-যাওয়ার পথের দিকে উদাস, অতল কালো চোখে তাকিয়ে থাকত।

বহুদিন ও-পথে আমাদের আর যাতায়াত নেই। জ্যাকব নিশ্চয়ই এতদিন আর বেঁচেও নেই। তবু ওখান দিয়ে আর কখনও যদি যাই, নিশ্চয়ই জ্যাকবের খোঁজ করব।

সাইকেলের সিট

সাইকেলটা ছিলো মফিজউদ্দিন তালুকদারের। সবাই তাঁকে মফিজ সাহেব বলতো। আমরা বলতাম মফিজকাকা।

মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরা, ফুলশার্ট হাতা গোটানো। মুখে একগাল চাপ দাড়ি, চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল। বোধহয় বেশি ব্লাডপ্রেশার ছিলো মফিজ সাহেবের।

ভদ্রলোক পাড়াগাঁয়ে মামলাবাজ জোতদার ছিলেন। আমার বাবার এবং তার আগে আমার ঠাকুর্দার বাঁধা মক্কেল। নানা রকম ছোট বড় দেওয়ানি ফৌজদারি মামলা ছিলো তাঁর। মামলার কাজে মাসে অন্তত দু'-একটা দিন তাঁকে আমাদের বাড়িতে আসতে হতো।

আসতেন সাইকেলে চড়ে খুব সকাল সকাল। কাছারিঘরের সামনে সাইকেল থেকে নেমে দু'-তিনবার জোরে জোরে সাইকেলের ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিতেন। বোঝা যেতো, মফিজ সাহেব এসে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি আর দাদা উত্তেজিত হয়ে যেতাম। সেদিন সকালবেলায় লেখাপড়া টংয়ে উঠতো।

উত্তেজনার কারণ আর কিছুই নয়, ঐ মফিজ সাহেবের সাইকেল। মামলাবাজ হলে কি হয়, অত্যন্ত উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন মফিজকাকা। আমাদের অল্প বয়সে দেখা সামান্য কিছু লোকেব মধ্যে তিনি হলেন একজন, যিনি সাইকেলে তালা দিতেন না এবং আমরা চড়লে কোনো রকম আপত্তি করতেন না। শুধু বলতেন, 'একটু সাবধানে চড়ো, দেখো, চোট না পাও।'

অন্যদের আপত্তির অবশ্য যথেষ্ট কারণ ছিলো। আমার এবং দাদার অত্যাচারে সাইকেলধারী কোনো মক্কেল বা বাইরের লোক আমাদের বাড়িতে সাইকেল নিয়ে আসতে সাহস করতো না। প্রায় সবাই তাদের সাইকেল অন্য কোনো বাড়িতে বা বাজারের কোনো দোকানে রেখে আসতো। যে দু'-একজন বাসায় সাইকেল নিয়ে আসতো, তারাও আমাদের ভয়ে সাইকেলে শক্ত তালা দিয়ে রাখতো।

একটু আধটু সাইকেল যদি কোনো বাচ্চা ছেলে চড়ে, তাতে খুব বেশি আপত্তি হবার কথা নয়। কিন্তু আমার এবং আমার দাদার সাইকেল ব্যবহার ছিলো খুব নির্দয়. বলা যায় সাইকেল হাতে পেলে আমরা সেটার উপর রীতিমতো অত্যাচার করতাম।

অত্যাচারের ধরনগুলি ছিলো নানা রকম। আমাদের বুড়ো কুকুর ভোলাকে সিটে বসিয়ে পিছনের কেরিয়ারে বসে আমি তাকে ধরে থাকতাম, আর দাদা রডের উপর বসে সাইকেল চালাতেন। কখনো কখনো আমরা দ্রুতগতিতে রাস্তা থেকে বাড়ির সামনের পুকুরের ঢালু পাড় বেয়ে জলের মধ্যে নেমে যেতাম। সাইকেল এবং আমাদের স্নান একসঙ্গে সারা হতো। আবার কখনো আমাদের ভাঙা দালানের বারান্দা দিয়ে পাক মেরে সিঁড়ি বেয়ে সার্কাসী কায়দায় আমরা উঠোনে নামতে যেতাম। এই প্রক্রিয়ায় শুধু যে সাইকেল ভাঙতো তা নয়, আমাদের নিজেদের দাঁতও ভেঙেছে, মাথাও ফেটেছে।

শুধু সাইকেল নয়, তখনো মফঃস্বল অঞ্চলে কিছু কিছু ঘোড়ায় চড়া চালু ছিলো। যদি আমাদের বাড়িতে কেউ ঘোড়ায় চড়ে আসতো তা হলে তো আমাদের পোয়াবারো। এর একটা প্রধান কারণ ছিলো, ঘোড়ায় তালা দেওয়া যেতো না। তবে ঘোড়ার মালিক

সাবধানতাবশত ঘোড়া থেকে নেমে, ঘোড়াটাকে কাছারিঘরের বারান্দার খুঁটির সঙ্গে বেঁধে লাগামটা খুলে নিজের কাছে রেখে দিতেন। তাতে আমাদের ফুর্তি কিছু কম হতো না। বলগাহীন ঘোড়ায় চড়ার আনন্দ কিছু কম নয়।

ঘোড়ার মালিক চোখের আড়াল হতেই আমরা ঘোড়াটিকে দড়ি খুলে আমাদের আওতার মধ্যে নিয়ে আসতাম। কেন জানি না, আমাদের উপর সমস্ত ঘোড়ার ছিলো জাতক্রোধ। ঘোড়ায় চড়তে গেলে ঘোড়ার চাঁটি সবাই কখনো না কখনো খায়, খেতে পারে। কিন্তু ঘোড়ারা আমাদের নির্যাতনে অস্থির হয়ে আমাকে আর দাদাকে দুজনকেই একাধিকবার কামড়েছে। একবার একটা কালো ঘোড়া আমার ঘাড় প্রায় পাঁচ মিনিট কামড়ে ধরে রেখেছিলো, পরে দাদা ঘোড়ার দু নাকের মধ্যে দুটো পেনসিল ঢুকিয়ে আমাকে সেই মারাত্মক আগ্রাসন থেকে রক্ষা করে। আমার কাঁধের উপরে শার্টের কলারের নিচে এখনো তিনটে ঘোড়ার দাঁতের দাগ স্পষ্ট দেখা যায়। সেটা আমার বলগাহীন অশ্বারোহী জীবনের স্মৃতিচিহ্ন।

সাইকেলের কথায় আসি।

আমাদের পাড়ার প্রত্যেক বাড়িতে একটি কি দুটি করে সাইকেল ছিলো। কিন্তু আমাদের ভাইদের লেখাপড়া গোল্লায় যাবে এই অজুহাতে এবং নিজেদের সাইকেল হলে আমরা অবশ্যই দুর্ঘটনা ঘটিয়ে চিরকালের মতো বিকলাঙ্গ হয়ে যাবো এই রকম চিন্তা করে, আমাদের বাড়িতে কোনো সাইকেল কেনা হয়নি।

সে সময় আজকালের মতো লোকের ঘরে ঘরে টেলিফোন, টেলিভিশন বা রেফ্রিজারেটর ছিলো না। খাট-বিছানা, চেয়ার-টেবিল, বাসনপত্র এবং গয়নাগাটি ছাড়া প্রথম যা গৃহস্থের সংসারে প্রবেশ করে সেটা হলো সাইকেল। সংসারে সাইকেলের এই প্রবেশ অবশ্য আমাদের ছোটবেলার আরো অনেক আগেকার, তার সূচনা হয়েছিলো এই শতাব্দীর গোড়াতেই। কাদের বাড়িতে এলাকার মধ্যে প্রথম সাইকেল এসেছিলো তা নিয়ে মফঃস্বলে অনেক পরিবারেরই গর্বের ব্যাপার ছিলো। একই গ্রামে একসঙ্গে পাঁচ-সাতটা পরিবার দাবি করতো যে, তাদের পরিবারেই সর্বপ্রথম সাইকেল আসে। অনেক প্রাচীন ব্যক্তিকে এ নিয়ে সাক্ষী মানা হতো।

তবে আমি আর আমার দাদা যখন সাইকেল-পাগল, তখন সাইকেল আর স্ট্যাটাস সিম্বল নয়, তার স্থান নিয়েছে রেডিয়ো।

সে যা হোক, বাড়িতে সাইকেল না থাকার জন্যেই হোক বা আমাদের চরিত্রদোষেই হোক, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার দাদার সাইকেল-পিপাসা বাড়তে লাগলো। বাড়িতে কেউ সাইকেলে এসে সামান্য অন্যমনস্ক হলেই আমরা তার সাইকেল নিয়ে উধাও হতাম। ক্রমশ খুব নতুন লোক ছাড়া প্রায় সকলেই এ বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে।

তখন যুদ্ধের বাজার, মোটর গাড়ির মতো সাইকেলেরও লাইসেন্স হয়েছে। তাতে নম্বর লাগাতে হচ্ছে। এক অসতর্ক মক্কেলের এই রকম একটা নম্বরি সাইকেল লুকিয়ে নিয়ে দাদা এবং পাড়ার আরো তিনজন একদিন আমাকে সাইকেল চড়া শেখাতে যায়।

সাইকেল চড়া শেখানো খুব সোজা। আমাদের পাড়ার পাশে খালের উপরে কাঠের সাঁকো। সেই সাঁকোর পরে যেখানে রাস্তা ঢালু হয়ে নেমে গেছে সেখানে আমি সিটের

pathagar.net

সামনের রডের উপর হ্যান্ডেল ধরে বসলাম, পিছনে দাদা বা কেউ ধরে থাকলো। কয়েক মুহূর্তের স্থিতাবস্থার পর আচমকা সাইকেলটা সামনের দিকে ধাক্কা দিলেই কিছুটা মাধ্যাকর্ষণের টানে কিছুটা ধাক্কার বেগে আমি বিদ্যুৎবেগে সামনের দিকে এগোতে লাগলাম, কোনো রকম পেডাল-টেডাল করার দরকার নেই।

প্রথম দিকে ধুপধাপ পড়ে যাচ্ছি, পা কাটছে কপাল ফাটছে, রক্ত, টিংচার আয়োডিন, ভয়াবহ সে শিক্ষা। মারাত্মক হল একটু পরে, পুলের মুখে রওনা হওয়ার আগেই নীচে একটা নৌকোর ওপরে পড়ে গেলাম ডিগবাজি খেয়ে সাইকেলসুদ্ধ। ভাগ্যিস সেটা ছিল খড়ের নৌকো, তাই প্রাণে বেঁচে গেলাম, কিন্তু সাইকেলটা কেমন মোষের শিংয়ের মতো বাঁকা হয়ে গেল। তার চেয়েও বড় কথা, সেই নম্বরি লাইসেন্সটা—যেটা সাইকেলের সঙ্গে লাগানো ছিলো, খড়ের গাদায় না খালের জলের মধ্যে সেটা কোথায় যে হারিয়ে গেলো, প্রবল অনুসন্ধান করেও সেটা উদ্ধার করা গেলো না। ভাঙা সাইকেলটি মাথায় নিয়ে বাসায় এলে ফল যা দাঁড়ালো সেটা মর্মান্তিক। সাইকেলের যিনি মালিক, তিনি তাঁর সাইকেলের অষ্টাবক্র ভগ্নদশা দেখে যতটা দুঃখিত হলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি বিহ্বল হয়ে পড়লেন সাইকেলের নম্বরী লাইসেন্সটা হারিয়ে যাওয়ায়। সেটা ছিলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের থমথমে যুগ আর তাঁর ছিল প্রচণ্ড রাজভয়। এই নম্বরহীন সাইকেলের মালিকানার জন্যে তাঁর কী পরিণতি হতে পারে তা ভেবে তাঁর মুখমণ্ডল ক্রমশ ফ্যাকাশে থেকে ফ্যাকাশেতর হতে লাগলো। কত কী বিপদ হতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। বাবা এবং মুহুরিবাবুরা যত তাকে বলেন যে, ভয়ের কিছু নেই, এটা সামান্য ব্যাপার আর তা ছাড়া কোতোয়ালি থানার বড় জমাদারকে আমরা মাসে দশ টাকা পান-খরচ বাবদ মাসোহারা দিই—তিনি তত অস্থির হয়ে পড়েন, 'আমার কী হবে, ছেলেপুলে বৌবাচ্চা নিয়ে উকিলবাবুর ছেলেদের জন্যে আমি মারা পড়লাম' বলে তিনি কপালে করাঘাত করতে লাগলেন।

অবশেষে অনেক আলোচনা করে সাব্যস্ত হলো যে, আমাদের রান্নাঘরের পিছনে মানকচু গাছের ঝোপের মধ্যে একটা বড় গর্ত করে সাইকেলটাকে আপাতত লুকিয়ে ফেলা হবে। পরে কোনকালে যদি যুদ্ধটুদ্ধ মিটে যায়, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে, তখন সাইকেলটাকে মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করা হবে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে সাইকেলটাকে কবর দেওয়া হলো। দাদা সেখানে একটা কঞ্চি পুঁতে দিলো যাতে সুদিন এলে উদ্ধার করার সময় কোনো অসুবিধা না হয় খুঁজে পেতে। এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল করাতে চাই যে, পাড়ার লোকেরা যখন সবাই জানতো আমাদের বাড়িতে কোনো সাইকেল নেই, তখন আসলে কিন্তু আমাদের বাড়িতে ভূগর্ভে একটি দ্বিচক্রযান রয়েছে। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে পাতাল রেলের চল্লিশ বছর আগে দূর মফঃস্বলে আমরা একটি সাইকেল মাটির নীচে পুঁতে এই উপমহাদেশের সর্বপ্রথম সূচনা করি ভূগর্ভযানের। একে বলা চলে মেট্রো সাইকেল।

বাবা সাইকেলওয়ালাকে ষাট টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন, ফলে সাইকেলটার মালিকানা আমাদেরই এসে গিয়েছিলো। আমরা দু'ভাই সুদিনের অপেক্ষায় ছিলাম, কবে সাইকেলটা মাটি খুঁড়ে তোলা হবে। আর এই ক্ষতিপূরণ দেওয়া বাবদ আমরা বুঝে গিয়েছিলাম ঐ প্রোথিত সাইকেলটাই আমাদের ভরসা, বাবা আর দ্বিতীয় কোনো সাইকেল কিনে দেবেন না।

প্রথম দিনের সাইকেল চড়া শিক্ষায় আমার যে কঠিন অভিজ্ঞতা হয়েছিলো, তাতে কিন্তু আমি মোটেই নিরুদ্যম বা পিছপা হইনি।

উঞ্ছবৃত্তি করে বা লুকিয়ে চুরিয়ে এর সাইকেল নিয়ে সেই খালপাড়ে গিয়ে দাদার কাছে সাইকেল চড়া শিখতে লাগলাম। একসঙ্গে কোনো সাইকেল বেশি সময়ের জন্যে পাই না, পর পর দুদিনও পাই না, ফলে শিখতে বেশ একটু সময়ই লাগলো। একাধিক সাইকেল জখম হওয়ার পরে সাইকেলের মালিকদের চিৎকার গালিগালাজে আমার আর দাদার খ্যাতি এত প্রচারিত হয়ে পড়ে যে, ক্রমশ সাইকেলওয়ালারা আমাদের সম্পর্কে সতর্ক এবং কঠিন হয়ে পড়েন। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে, ভাড়া করে সাইকেল চড়া শিখবো তার পর্যন্ত উপায় নেই, কোনো সাইকেল ভাড়ার দোকানদার আমাদের সাইকেল ভাড়া দিতো না।

এই সময়েই মফিজউদ্দীন তালুকদার সাহেবের উদারতায় আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই। আমাদের কাছারিঘরের সামনে একটি মহীরুহ-প্রতিম জাম্বো সাইজের জবাগাছের সঙ্গে সাইকেল ঠেস দিয়ে রাখতেন মফিজ সাহেব, কোনোরকম তালাটালা না দিয়ে।

তিনি নিজে থেকেই যেদিন আমাদের সেধে সাইকেলটা চড়তে দিলেন, আমাদের ঘটনাটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হলো। কোনো মানুষ যে এত মহৎ, এত ভালো হতে পারে, সে আমরা কল্পনাও করতে পারিনি।

মফিজ সাহেব যখন আসতেন, সাইকেলটা আমাদের জিম্মায় রেখে বাবার সঙ্গে আদালতে যেতেন, পরে বিকেলে আদালতের কাজ সাঙ্গ করে আমাদের বাড়ি এসে আমাদের কাছ থেকে তাঁর সাইকেলটা উদ্ধার করে গ্রামের দিকে রওনা হতেন।

আমরা মফিজ সাহেবের উদারতার প্রতি শ্রদ্ধাবশত তাঁর গাড়িটির উপর খুব বেশি অত্যাচার করতাম না। মফিজ সাহেব নিজেও আমাদের অনুরোধ করেছিলেন, সাবধানে সাইকেলটা ব্যবহার করতে। পুরনো সাইকেল, আমরা পড়ে গিয়ে যদি কোনো চোটটোট পাই, সে জন্যে তিনি একটু উদ্বেগ প্রকাশ করতেন।

আমি ভালোভাবে সাইকেল চড়া শিখি ঐ মফিজ সাহেবের সাইকেলেই। খালধারের পুলপারে সে বছর শীতে সাইকেল চড়া শেখার ধুম পড়ে গিয়েছিলো। সেই প্রথম আমাদের ওখানে মেয়েরা সাইকেল চড়া শেখা আরম্ভ করলো। এবং অন্যান্য ব্যাপারের মতই মেয়েরা সাইকেল চালানো শেখা ছেলেদের চেয়ে ঢের তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করলো। অবশ্য তখনো আমরা লেডিস সাইকেল দেখিনি, ছেলেদের আর মেয়েদের সাইকেলে কোনো পার্থক্য ছিলো না।

পুলপারের পাশেই রাস্তার ধারে একটা কুঁড়েঘর বেঁধে এক বুড়ি বাস করতো। সে রাস্তার পাশের দেয়ালে গোবরের ঘুঁটে দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো। খালধারের সাইকেল-চড়া শিক্ষার্থীদের গাড়িতে চাপা পড়া তার নিত্যনৈমিত্তিক কাজ ছিলো। সে যতবার সাইকেল চাপা পড়েছে, তার রেকর্ড রাখা হলে বিলিতি রেকর্ডবুকে নিশ্চয় ছাপা হতো।

এ বিষয়ে আমার কৃতিত্ব ছিলো সবচেয়ে বেশি। আমি বোধহয় অন্তত পঁচিশবার চাপা দিয়েছিলাম বুড়িকে। একদিন ঘটেছিলো মারাত্মক ব্যাপার। এক ঘণ্টার মধ্যে আমি পর পর দুবার ঐ হতভাগ্য বৃদ্ধাকে চাপা দিলাম। প্রথমবারে সে কিছু বলেনি, যথারীতি মাটি থেকে উঠে গায়ের ধুলো ঝেড়ে গজ গজ করতে করতে আবার ঘুঁটে লাগাতে লাগলো। কিন্তু ঐ দ্বিতীয় দফায় যখন সে চাপা পড়লো, সে মাটিতে গড়াতে গড়াতে

আমার দিকে তাকিয়ে চিনতে পেরে ডুকরে কেঁদে উঠলো, 'ওগো, একই ছোঁড়া আমাকে একদণ্ডের মধ্যে দুবার চাপা দিলো গো!'

মফিজ সাহেবের সাইকেলের সদ্ব্যবহার করার সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম শুধু তাঁর ঔদার্যবশত নয়, এর মধ্যে একটা সাংঘাতিক কার্যকারণও ঘটে গিয়েছিলো।

একদিন মফিজ সাহেব সাইকেলটা আমাদের কাছে রেখে বাবার সঙ্গে আদালতে গেলেন, (সেদিন কী একটা ফৌজদারি মারদাঙ্গা মামলার রায় বেরোনোর কথা, তিনিই ছিলেন মূল আসামী, এতদিন জামিনে খালাস ছিলেন), সন্ধ্যাবেলা আর আমাদের বাড়িতে সাইকেল নিতে এলেন না।

বাবা আদালত থেকে শুকনো মুখে এসে বললেন, 'খুব খারাপ ব্যাপার হয়ে গেলো। তালুকদার সাহেবের দু'বছর জেল হয়ে গেলো। হাকিমের কাছে জামিন চাইলাম, আপীল করবো বলে। তাও দিলো না। মফিজ সাহেবকে আদালত থেকে সোজা জেলে পাঠিয়ে দিলো।'

রাতে খাওয়ার সময় রান্নাঘরের বারান্দায় পিঁড়িতে বসে খেতে খেতে বুড়ো মুহুরিবাবু আমাদের বললেন, 'মফিজ সাহেব সাইকেলটা তোমাদের যত্ন করে রাখতে বলেছেন। জজ কোর্টে আপীল হয়ে জামিন পেয়ে গেলেই উনি জেল থেকে বেরিয়ে এসে সাইকেলটা নেবেন। সাইকেলটা ভালোভাবে রেখো।'

মফিজ সাহেবের জেল হওয়ার সংবাদ পেয়ে সেদিন সারা সন্ধ্যা আমি আর দাদা হাত তুলে নেচেছি। সত্যি কথা বলতে কি, আজ পর্যন্ত জীবনে আর কোনোদিন আর কোনো ঘটনায় এত আনন্দ পাইনি।

বাবা যা আশা করেছিলেন তা কিন্তু হলো না, মফিজ সাহেবকে জেল থেকে খালাস করা গেলো না। আগের মামলাটার আপীল করবার আগেই আরেকটা ফৌজদারি মামলায় তাঁর আবার সাজা হলো। আসলে যে হাকিমের ঘরে আগেরবার তাঁর সাজা হয়েছিলো, পরের মামলাটাও সেখানেই হয়। সেই হাকিমসাহেব এবারও তাঁকে দু'বছরের সাজা দিলেন।

মফিজ সাহেবের আর জেল থেকে বেরুনো হলো না। একদিন বিকেলবেলা দাদা জেলখানার সামনের রাস্তা দিয়ে কোথায় যাচ্ছিলো, দেখতে পায় যে মফিজ সাহেব জেলের ফটকের গারদ ধরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন, তাঁর চেহারা একদম ভেঙে গেছে।

দাদা সাহস করে জেলের দরজার কাছে গিয়ে মফিজ সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে। দাদাকে দেখে খুব খুশি হন তিনি, বাবার কথা বলেন, 'উকিলবাবু খুব চেষ্টা করলেন, আমারই ভাগ্য খারাপ।' তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, 'উকিলবাবুকে বলবে, যা দরকার সবই যেন করেন, আমাকে এখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে। বেশি দিন থাকলে আমি বাঁচবো না।'

সাইকেলের কথা সেদিন মফিজ সাহেব কিছু বলেননি। দুদিন পরে বুদ্ধি করে আমি আর দাদা জেলখানায় তাঁকে তাঁর সাইকেলটা দেখাতে নিয়ে গেলাম। তিনি কিন্তু সাইকেল নিয়ে মোটেই মাথা ঘামালেন না, কেবল জেল থেকে কবে খালাস হবেন, তাই নিয়ে কাতরোক্তি করলেন। তখন তাঁর মন ছটফট করছে বাইরে বেরোনোর জন্যে। তাঁর ঘন কালো চাপদাড়ি

হঠাৎ তাড়াতাড়ি পাকতে শুরু করেছে, চুলও সাদা হয়ে যাচ্ছে, মুখ ভেঙে গেছে। দেখে আমাদের কেমন মায়া হলো মফিজকাকার জন্যে।

কারাবাসের মেয়াদ ফুরোবার আগেই তাঁর জীবনের মেয়াদ শেষ হল। একদিন বিকেলবেলা আদালত থেকে ফিরে আমাদের বুড়ো মুহুরিবাবু বললেন, 'আজ সকালে হার্টফেল করে মফিজ সাহেব মারা গেছেন।'

পরদিন সকালে বাবা একটা লোক ঠিক করে মফিজকাকার গ্রামের বাড়িতে সাইকেলটা ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। সেদিন আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল; এর সবটাই সাইকেলের শোকে নয়, কিছুটা ঐ গ্রাম্য, সরল, দাঙ্গাবাজ, উদার লোকটির জন্যে। এখনো আমাদের পুরনো শহরে যখন যাই, জেলখানার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে চল্লিশ বছর আগের মফিজকাকার কথা মনে পড়ে। আমার দাদা বহুদিন বিগত হয়েছে, আজ চল্লিশ বছর মফিজকাকাকে আমি মনে রেখেছি; মফিজকাকা অমর রহে।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলো একদিন। বাড়ির সবাই ভুলে গিয়েছিলো, আমি আর দাদা কিন্তু ভুলিনি। এখন আর ভয়ের কিছু নেই, তাছাড়া সাইকেলের লাইসেন্সের ব্যাপারটাও উঠে গেছে।

পঁয়তাল্লিশ সালের শীতের গোড়ায় অ্যানুয়াল পরীক্ষার পরে একদিন কঞ্চির নিশানা মিলিয়ে আমরা দুভাই কোদাল দিয়ে মানকচুর ঝোপের মাটি খুঁড়ে সেই দোমড়ানো সাইকেলের কঙ্কাল উদ্ধার করলাম।

মানকচু গাছের নিষ্ঠুর শোষণে তখন আর সেই সাইকেলের কিছুই প্রায় নেই, তুলতেই ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়লো। চেন, চাকা, স্পোক, প্যাডেল, হ্যাণ্ডেল সব টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। মরচে ও জং ধরে ভাঙা অবস্থায় সেটাকে সম্পূর্ণ করে একটা সাইকেল হিসেবে কল্পনা করাও কঠিন।

শুধু সেই সাইকেলের সিটটা—সেটা যে কিসের চামড়া দিয়ে তৈরি ছিলো কে জানে, সেটা তখনো অটুট রয়েছে। শুধু অটুট নয়, কচুবনের রসে-জলে সেটা আরো টনটনে আরো শক্ত হয়েছে। আর কি রকম একটা কষায় গন্ধ বের হচ্ছে সিটটা থেকে, ঠিক জলে ভেজা চামড়ার পচা গন্ধ নয়, কেমন যেন একটা আমিষ মাদকতাময় গন্ধ।

আমি আর দাদা মুহ্যমান হয়ে সেই দ্বিচক্রযানের ভগ্নস্তূপের দিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ আমাদের পোষা কুকুরটা, যার নাম ভোলা, তখন সে আরো বুড়ো, তার চোখে ছানি পড়েছে, ভালো করে দেখতে পায় না, সে কোথা থেকে শুঁকতে শুঁকতে এসে হঠাৎ তড়িৎগতিতে সিটটাকে মুখে নিয়ে দৌড় লাগালো। এবং সেটাই তার পক্ষে বড় ভুল হলো। সে উঠোন পেরোনোর আগেই ওপাশে কয়েকটা বারোয়ারি কুকুর ছিলো রাস্তার দিকে, তারাও এই গন্ধ পেয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

আমরা কিছু বোঝার আগেই এরকম একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটলো। কিন্তু বৃদ্ধ ভোলার পক্ষে সমবেত আক্রমণ থেকে সিটটা বাঁচানো অসম্ভব ছিলো। আমি আর দাদা দুটো মোটা বাঁশ নিয়ে কুকুরদের তেড়ে গেলাম। কিন্তু তখন তারা চামড়ার নির্যাসের অনৈসর্গিক গন্ধে উন্মাদপ্রায়। কিছুই করা গেলে না। শুধু বাঁশ দিয়ে কুকুর পিটিয়ে হ'তের কিঞ্চিৎ সুখ হলো।

সেদিনের সারমেয় সংগ্রাম প্রায় দু'ঘণ্টা স্থায়ী হয়েছিলো। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, হতাশ সারমেয়বৃন্দ

একে একে সাইকেলের সিট ও রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করার পর আমরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম, সেই সিটটি উঠোনের একপাশে অক্ষত অবস্থায় পড়ে আছে, তাতে কেউ দন্তস্ফুট করতে পারেনি।

এটা একটা অকল্পনীয় ব্যাপার। যে কুকুরেরা এই জীবনপণ সংগ্রাম করেছিলো, তাদের প্রত্যেককেই আমরা তাদের চোখ-ফোটার বয়স থেকে চিনি। এর মধ্যে একজন, তার নাম আমরা দিয়েছিলাম কালান্তক, সে ছয় মাস বয়সে আমার ঠাকুমার পুজোর ঘরে ঢুকে একটা বড় সাইজের পুরীর শঙ্খ পাউডারের মত গুঁড়ো করে খেয়েছিলো। আরেকজনের নাম দেওয়া হয়েছিলো বীরবাহু, সে একটা পাঁঠাকাটা খড়্গের কাঠের হাতলটা স্থানীয় কালীবাড়ির ভাঁড়ারঘরে জানালা দিয়ে ঢুকে দেয়ালে ভর করে দুপায়ে দাঁড়িয়ে চিবিয়ে শেষ করে দিয়েছিলো। শেষে সেই খাঁড়াটি মাথায় পড়ে, তার মাথায় আড়াআড়ি ভাবে সেই ক্ষতচিহ্ন তার আজীবন স্পষ্ট ছিলো।

সিটটা অক্ষত অবস্থায় আমরা ফেরত পেলাম। দাদা সেটা যত্নে তুলে রাখলো। তখন সাইকেলের নেশা আমাদের কেটে গেছে, আমরা একটা নতুন খেলা আবিষ্কার করলাম, তার নাম দেওয়া হলো, দাঁত ফোটাও।

প্রত্যেকদিন বিকালে আমি আর দাদা সেই সুগন্ধ সিটটা বাতাসে কয়েকবার আন্দোলিত করে বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে 'আয় আয় তুতু-চুচু' করে ডাকতাম। সঙ্গে সঙ্গে পাড়া বেপাড়ার কালান্তক-বীরবাহু সমেত অনেক কুকুর ছুটে আসতো, আমরা ছুঁড়ে দিতাম সামনের মাঠে ঐ মৃত্যুঞ্জয় সাইকেলের সিট। তারপর ঘণ্টাখানেক জীবনপণ লড়াই, পরাস্ত কুকুরেরা একে একে বিদায় নিতো, আমাদের বাইরের মাঠের একপাশে দন্তচিহ্নহীন পড়ে থাকতো সেই অলৌকিক চামড়ার সিট।

এমনভাবে বহুদিন গিয়েছিলো। উনিশশো পঞ্চাশ সালের সাম্প্রদায়িক গোলমালের পরে আমাকে আর দাদাকে বাবা পাঠিয়ে দিলেন কলকাতা, কালীঘাটের বাড়িতে। তখন, এমন কি এখনো, আমাদের তেমন কোনো বোধ জন্মায়নি সম্প্রদায় ব্যাপারটা নিয়ে, শুধু কলকাতা আসার আনন্দে চলে এলাম।

বিশেষ কিছু জিনিসপত্র নিয়ে আসিনি। আমার সঙ্গে একটা বোঁচকা, দাদার সঙ্গে একটা। বোঁচকার মধ্যে সামান্য দু'-চারটে জামাকাপড়, কয়েক টুকরো আমসত্ত্ব, এক শিশি ঘি, অল্প ডালের বড়ি, কয়েকটা খইয়ের মোয়া—মা-পিসিমা-দিদিমা যে যেমন দিয়ে দিয়েছে, আমাদের কলকাতার জীবনসংগ্রামের পাথেয় হিসেবে।

আমাদের বাড়ি থেকে নদী পার হয়ে সিরাজগঞ্জ, সেখান থেকে সরাসরি রেলগাড়ি কলকাতার শিয়ালদায়। কিন্তু পথের মধ্যে দুটি বাধা দর্শনা আর বানপুর, পাকিস্তান আর ভারতের কাস্টমস চেকিং।

দর্শনায় যখন শুল্কসাহেবেরা তল্লাসি করলেন, আমার মনে কোনো সংশয় নেই, ঘি, ডালের বড়ি এগুলো কোনো ব্যাপার নয়। আমি পার পেয়ে গেলাম। কিন্তু দাদার বোঁচকার নিচ থেকে বেরোল সেই গন্ধমাদন সাইকেলের সিট। দাদা যে কেন সেটা আনলো, কি জানি!

দাদা কাস্টমসের লোকদের বলেছিলো, কিছু নেই। সিটটা বেরোনোর পর দাদা কিছুটা চোরের মতো সঙ্কুচিত, কিছুটা নববধূর মতো সলজ্জ হাসি হেসে বললো, 'এটা কিছু না।'

কাস্টমসের লোকেরা কিন্তু ব্যাপারটা সহজভাবে নিলো না। সাইকেলের সিটটা তারা একে একে হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। যে গন্ধটা ঐ পচনরোধক শক্ত হয়ে দুমড়িয়ে যাওয়া চামড়ার আসনটা থেকে বেরিয়ে আসছিলো, সেটাও খুব মনোরম নয়। আমি আর দাদা, সেই সঙ্গে তারাও কেউ কেউ, নাকে রুমাল চাপা দিতে বাধ্য হলাম।

কেন আমরা এই মহামূল্যবান অজ্ঞাতপরিচয় বস্তুটি পাকিস্তান থেকে ভারতে চালান করছিলাম, দাদা এর কোন সদুত্তর দিতে পারেনি। আমরা ক্ষীণকণ্ঠে দু'-একবার বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম, এটা একটা পুরানো সাইকেলের সিট, বহুদিনের স্মৃতি—তাই নিয়ে যাচ্ছি। তারা সেটা বিশ্বাস করল না।

সে ট্রেনে আর আমাদের কলকাতায় আসা হলো না, প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা টানা জেরা চললো দুজনের। অবশেষে পরের দিন তারা ক্লান্ত হয়ে আমাদের ছেড়ে দিলো। কিন্তু সেই সাইকেলের সিটটা কি বুঝে রেখে দিলো।

এর বছর দুয়েক পরে ঐ দর্শনা স্টেশন দিয়ে বাড়ি ফিরছি। প্লাটফর্মে নেমে দেখি পাশের কাস্টমসের ঘরে দারোগা সাহেবদের টেবিলে আমাদের সেই সাইকেলের সিটটি উল্টে রাখা আছে, সেটা একটা চমৎকার বড়সড় ছাইদানের কাজ করছে।

এর পরে উনিশশো পঁয়ষট্টি সাল পর্যন্ত যতবার দর্শনার পথে বাড়ি গেছি, কৌতূহলবশত প্ল্যাটফর্ম থেকে দারোগা সাহেবদের ঘরে তাকিয়ে দেখেছি সাইকেলের সিটটা অক্ষত, অটুট অবস্থায় উলটো হয়ে ছাইদানের দায়িত্ব পালন করছে। তবে সেটা তখনো গন্ধময় কিনা সেটা অনুসন্ধান করিনি।

আজকাল বাড়ি যাওয়া কম। দর্শনার পথে বাড়ি যাওয়া তো হয়ই না, সরাসরি রেলগাড়ি বন্ধ। জানি না আমাদের সেই সাইকেলের সিটটা দারোগাবাবুদের টেবিলে এখনো বিদ্যমান কি না!

pathagar.net

গর্জন তেল

কোথাও কোনো সুদূর দেশে, কোনো গহন অরণ্যের গভীরে কিংবা পর্বতের কন্দরে রয়েছে সেই এক অচেনা মহীরুহ, যার কাঠে রাজপ্রাসাদ তৈরি হয়। যার বল্কল দিয়ে গড়া হয় সমুদ্রের জাহাজের খোল, যার বড় বড় গোলপাতা দিয়ে বানানো হয় সাহেবদের ছবির মতো ডাকবাংলোর ছাউনি।

আমাদের ছোট বয়সে দুটি আশ্চর্য গাছের কথা আমরা জানতাম। নন্দন কাননের পারিজাত তরুর চেয়ে সেই দুটি রূপকথার গাছ কম আকর্ষক ছিল না।

প্রথম গাছটি মহীরুহ, বিরাট—বিশাল। তার মোটা গুঁড়ি, বিপুল কাণ্ড, অজস্র ডালপালা। দ্বিতীয় গাছটি বৃক্ষ নয়, গুল্ম। জবা কি গন্ধরাজ ফুলের গাছের মতো। সে গাছের দু ডালে দু রকম ফল হয়, ছোট এলাচ আর বড় এলাচ। তার ফুল হল লবঙ্গ, তার খোসা হল দারচিনি আর ঝরে পড়া শুকনো পাতাটা হল তেজপাতা। একদিন ছিল, কিন্তু এখন আর এই গাছ দুটো পৃথিবীতে কোথাও নেই। আমাদের বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছ দুটো কোথায় হারিয়ে গেছে। সে যা হোক, ঐ প্রথম গাছটির কথা আরেকটু বলি। ঐ গাছটির কোটর দিয়ে গড়িয়ে পড়ে কাঁচা সোনার মতো ঝকঝকে এক তরল পদার্থ, তার নাম গর্জন তেল। তাই মাখানো হয় প্রতিমার গায়ে, সাধারণ লোকে বলে ঘাম-তেল। মাখানো মাত্র প্রতিমা ঝলমলিয়ে ওঠে, যেমন আজকাল চোখে পড়ে ল্যামিনেট-দেওয়া বইয়ের মলাট।

আমাদের অল্প বয়সের জীবন কেটেছিল নদীর ধারের এক গঞ্জ শহরে। সেই শহরের আর তার আশেপাশের সারা বছরের যা কিছু চাহিদা, যেসব জিনিস ওখানে মিলত না, সেগুলো বড় বড় মানোয়ারি নৌকোয় বর্ষাকালে আসত নদীর ঘাটে। বহু দূর থেকে আসত সব নৌকো—কলকাতা-ঢাকা-চট্টগ্রাম থেকে আসত চাল আর নারকেল আসত বরিশাল থেকে, মালদহ থেকে বড় বড় ফজলি আম, বুড়িগঙ্গার তীর থেকে আসত কানাইবাঁশি কলা। বহুদূর উত্তরপ্রদেশ থেকে শিলনোড়া, মশলাপাতি নিয়ে পশ্চিমা নৌকো আসত। কোনো কোনো জিনিস নৌকো থেকেই সরাসরি বিক্রি করা হত, আবার অন্যান্য নানা জিনিস সব নদীর ঘাটে নামিয়ে গরুর গাড়িতে বা কুলির মাথায় চলে যেত বাজারের দোকানে ও গুদামে।

একবার এক পশ্চিমা নৌকোয় এল অতিকায় কয়েকটা কাঠের পিপে। আমরা প্রায় প্রতিদিন বিকেলেই নদীর ধারে বেড়াতে যেতাম। কত রকম নৌকো, মানুষজন, জিনিসপত্র আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতাম। দেখতাম যে, কাঠের পিপেগুলো বেশ কিছুদিন ধরে নদীর ধারে পড়ে রয়েছে। বর্ষা শেষ হল। নদীর জল কমে যাওয়ার আগেই বিদেশী নৌকোগুলো বড় বড় পাল খাটিয়ে ফিরে যেতে লাগল। যে নৌকো কাঠের পিপেগুলো এনেছিল, সেটাও একদিন চলে গেল। কাঠের পিপেগুলো রয়ে গেল নদীর চড়ায়। কেউ সেগুলো নিতে এল না।

পরে শুনলাম, ঐ পিপেগুলোর মধ্যে আছে গর্জন তেল। চরের ব্যাপারিরা কী দরকারে আনিয়েছে। এখন প্রয়োজন পড়ছে না, শীতের সময় গরুর গাড়িতে তুলে নিয়ে যাবে। ঘাটের

চৌকিদারকে তারা বখশিশ দিয়েছে এগুলো ততদিন দেখে রাখার জন্যে। আর তাছাড়া ও জিনিস বিশেষ কারো কাজে লাগবে না। চুরি-চামারি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

ব্যাপারিদের এই ধারণা কিন্তু সঠিক ছিল না। আমি আর দাদা একদিন নদীর ওপার থেকে ফুটবল খেলে বাড়ি ফিরছি। খেয়ায় করে এপারে ঘাটে নেমেছি, তখন চারদিকে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। এদিক-ওদিকে দুটো-চারটে নৌকোয় কিংবা দোকানে কেরোসিনের কুপি বা লণ্ঠন জ্বলছে।

সময়টা ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি। পুজো প্রায় এসে গেছে। আমাদের পাড়ার দুর্গাবাড়িতে প্রতিমা বানানোর কাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। নদীর ধারে ধারে শুকনো ডালের ঝোপে সাদা ফুলের গোছা বেরোনো শুরু হয়েছে, বাতাসে শিউলি ফুলের আলাভোলা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। রাত হয়ে গেছে, বাড়িতে নিশ্চয় চেঁচামেচি শুরু হয়েছে, আমরা হন হন করে হেঁটে আসছিলাম। হঠাৎ ঘাটের ধারে যেখানে গর্জন তেলের পিপেগুলো রয়েছে, সেখানে দেখি একটা পিপের আড়ালে দুর্গাবাড়ির প্রতিমা বানানোর কুমোর, তার হাতে একটা মাটির কলসী। আমরা এগিয়ে যেতে সে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। দেখলাম একটা লোহার তার পিপের কাঠের ফাঁকে ঢুকিয়ে সে তেল বার করে কলসীতে ভরছে।

আমরা দুজনেই ব্যাপারটা দেখলাম কিন্তু তাকে কিছু বললাম না। কেনই বা বলব? আমাদের কী? যাদের তেল তারা বুঝবে। কিন্তু আমাদের দেখে কুমোর তেল চুরি করা বন্ধ করে মাটির কলসী হাতে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

এর কয়েকদিন পরে মহালয়ার দিন সকালবেলা দুর্গাবাড়িতে গেছি মার্বেল খেলতে। দেখি সেই কুমোর, তার হাতে সেই কলসী, কলসী থেকে গর্জন তেল বের করে প্রতিমার গায়ে লাগাচ্ছে। আমাদের চোখের সামনে ম্যাটম্যাটে দুর্গাপ্রতিমা ঝলমলিয়ে উঠল, অসুরের গায়ে কালো রঙে জেল্লা ফুটতে লাগল, সিংহের চোখমুখ ঝকঝক করতে লাগল।

আমার আর দাদার সেদিন মার্বেল খেলা হল না, আমরা সারা সকাল, দুপুরবেলা খাওয়ার সময় পর্যন্ত যতক্ষণ না বাড়ি থেকে লোক খুঁজতে এল, মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই গর্জন তেল মাখানো দেখলাম। গর্জন তেল মেখে দুর্গা-অসুর-সিংহ-মোষ, দুর্গার হাতের সাপ, লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্তিক-গণেশ, এমন কি গণেশের ইঁদুর পর্যন্ত আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল।

ব্যাপারটা দাদার মাথার মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা কাউকে কিছু না বলে দাদা একা একা একটা নারকেলের মালা আর এক টুকরো লোহার তার নিয়ে কোথায় গেল। ফিরল ঘণ্টাখানেক পরে।

ব্যাপারটা আমি ধরতে পেরেছিলাম। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি, নারকেলের মালায় করে কিছুটা গর্জন তেল খাটের পায়ার পাশে রাখা হয়েছে একটা ইঁটের গায়ে হেলান দিয়ে। দাদা একটু দেরি করে ঘুম থেকে উঠত। উঠে একবার উঁকি দিয়ে দেখে নিল, মালাটা ঠিক আছে কি না। তারপর হাত মুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে বাইরের বারান্দায় সিঁড়ির পাশে বসল, তারপর ধীরেসুস্থে হাতে-পায়ে, বুকে-পিঠে-মুখে সেই তেল মাখতে লাগল, যেভাবে শীতের দিনে লোকে গায়ে সরষের তেল মাখে।

বলা বাহুল্য, এর পরিণাম ভালো হয়নি। দাদার মুখ আর শরীরটা একটু চকচকে দেখাচ্ছিল কিন্তু ঐ তেল দাদার গায়ে আঠার মতো চটচটে হয়ে লেগে গেল, চোখে গিয়ে চোখ জ্বালা

করতে লাগল। সেদিন প্রচুর গরমজল আর সাবান-সোডা লেগেছিল দাদাকে পরিষ্কার করতে। আমার ঠাকুমা প্রায় দু'ঘণ্টার চেষ্টায় দাদাকে স্বরূপে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন।

এরপর অনেক কাল কেটে গেছে। আমার দাদাও কিছুদিন আগে মারা গেছেন। দাদার মৃত্যুর সময় আমি তাঁর কাছে ছিলাম না। দাদার একটা ফটো এসেছে আজকের ডাকে, মৃত্যুর পরে খাটে শুয়ে আছে।

হঠাৎ ছবির মধ্যে দাদার মুখটার দিকে তাকিয়ে অনেকদিন আগের এইসব কথা মনে পড়ল। মনে হল, দাদার মুখভরা যেন গর্জন তেল মাখানো রয়েছে, ঝকমক করছে মুখটা।

pathagar.net

লিটি-কিটি

কয়েকদিন আগে একটা পুরনোদিনের গল্প লিখতে গিয়ে লিটি-কিটির কথা মনে পড়ল।

লিটি আর কিটি দুই বোন। আমাদের এলোমেলো কৈশোরের যৌথ বান্ধবী, নর্মসহচরী। সে গল্পে তাদের দুজনকে সামান্য একটু ছুঁয়ে গেছি।

এতদিন পরে সামান্য ছুঁয়ে মন ভরেনি। তাই তাদের নিয়ে স্মৃতি রোমন্থন।

সত্যি কথা বলতে কী, সেই অমল কৈশোরে লিটি বা কিটিকে ভালো করে ছুঁয়েও দেখিনি। আজ এই তিনকাল পেরনো শেষকালের বয়েসে তাদের স্মৃতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারব না।

অন্য দশটা গল্পের মতো নয়, লিটি-কিটির কাহিনী খুব সাবধানে লিখতে হবে।

গল্প শুরুর সময়টা ভালো নয়। অথচ ভালো হতে পারত। মন্বন্তর, মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। একটু সামনেই বহু প্রতীক্ষিত, বহু আরাধনার, ভালোবাসার স্বাধীনতা। কিন্তু সেই স্বাধীনতা এল অনেক হানাহানি, মারামারি, আগুন, রক্তের মধ্য দিয়ে সঙ্গে নিয়ে এল ঘর ছাড়া, স্বজনহারা মানুষের অশ্রুসিক্ত পার্টিশন, অন্য নাম স্বাধীনতা।

আমাদের বাড়ি ছিল সমতল মধ্য বাংলার এক গহন মফস্বল শহরে। জলাকীর্ণ, ছায়াচ্ছন্ন সেই ছোট শহরের কথা, যাঁরা আমার গল্প পড়েন বা পড়েছেন হয়ত মনে করতে পারবেন।

সেটা সম্ভবত উনিশশো ছেচল্লিশ সাল, পুজোর সময়। আমাদের হতভাগ্য দেশ এখনও পাকিস্তান হয়নি। কিন্তু ঐ বয়েসেই বুঝতে পারি, চারদিক থমথমে, দিনকাল ভালো নয়।

দাদা তখন সদ্য টিন-এজার, আমি তার কাছাকাছি।

আমাদের শহরের পুলিশ সাহেব, মানে সাব-ডিভিশনাল পুলিস অফিসার হলেন এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ভদ্রলোক। সদ্য যুদ্ধ-ফেরত মিলিটারি অফিসারদের তখন নানা সরকারি দপ্তরে ঢুকিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ভদ্রলোক মিলিটারি থেকে এসেছিলেন।

লিটি-কিটি পুলিস সাহেবের যমজ কন্যা। তারা অবশ্য আমাদের শহরে থাকত না। কলকাতায় মামার বাড়িতে থেকে স্কুলে পড়ত, লরেটো স্কুলে।

লিটি-কিটি আমাদেরই সমবয়সিনী হবে, বড়জোর দুয়েক বছর ওদিকে। কিন্তু ফিরিঙ্গি কন্যারা সেই বয়েসেই রীতিমতো সাব্যস্ত যুবতী। হাইহিল জুতো, পনি-টেল কেশবিন্যাস, হাইনেক সাদা ব্লাউজ, প্লিট দেওয়া স্কার্ট—একজনের বেগুনি রঙের, অন্যজনের ঝলমলে নীল রঙের। তাদের দুজনকে প্রথম দেখি সে বছর মহালয়ার সকালে পোড়াবাড়ি ঘাটে।

কলকাতার ট্রেন আসে সিরাজগঞ্জ স্টেশনে সেখান থেকে যাত্রীরা স্টিমারে চড়ে আসে পোড়াবাড়ি ঘাটে। তারপর ঘোড়ার গাড়িতে কিংবা নৌকোয় যেতে হত আমাদের শহরে।

পোড়াবাড়ি থেকেই যাওয়া যেত পটল, চারাবাড়ি, এলাসিন এইরকম সব নামের স্বপ্নসবুজ গ্রামীণ স্টিমার স্টেশনে।

আমি, দাদা দুজনে যাচ্ছিলাম এলাসিন, আমাদের মামার বাড়িতে। আমরা পোড়াবাড়ি ঘাট থেকে স্টিমারে উঠব। দু ঘণ্টার পথ এলাসিন। সে বছর কী একটা কারণে এলাসিনের পুরনো বাজারের মাকালীর কাছে মহালয়ায় আমার দিদিমার মানতের পুজো ছিল। সে জন্যেই আমরা যাচ্ছিলাম।

পোড়াবাড়ি ঘাট থেকে আমরা স্টিমারে উঠব। ঘাটে স্টিমার এসে পৌঁছেছে। পুজোর বাজার, কত লোক যে বাড়ি আসছে। ভীষণ ভিড়, গাদাগাদি মানুষ, বাক্স-বিছানা। অবশ্য অর্ধেক লোকই আমাদের শহরের বা আশপাশের গ্রামের। তারা এখানেই নেমে যাবে। যাদের পয়সা আছে, তারা স্টিমার ঘাটের অদূরে সারি দিয়ে অপেক্ষমাণ জেলে ডিঙি থেকে ইলিশ মাছ কিনবে, একগণ্ডা মানে চারটি দু-টাকা বড়জোর তিন টাকা। ঘাটের অস্থায়ী মিষ্টির দোকান থেকে বড় বড় চমচম কিনবে এক হাঁড়ি। তারপর টমটম ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে বাড়িতে ফিরবে।

আমাদের ওখানে একটা কথা ছিল, নিশ্চয় এখনও আছে, আগের বাজার ভালো, পিছের বাজার ভালো নয়।

স্টিমার থেকে দেরি করে নামলে ভাল মাছ, মিষ্টি থাকবে না, দাম বেশি হবে। সবচেয়ে বিপদের কথা ঘোড়ার গাড়ি হয়ত পাওয়া যাবে না। তখন পায়ে হেঁটে যেতে হবে কিংবা নৌকো নিয়ে ঘুরপথে খাল-বিলের মধ্য দিয়ে শহরের ঘাটে পৌঁছতে অন্তত ছয় ঘণ্টা লাগবে। তা ছাড়া নৌকো তো ঘাটে পৌঁছবে, নৌকো থেকে নেমে বাড়ি পর্যন্ত পথটুকু আবার হাঁটতে হবে। বলাবাহুল্য, তখনও রিকশার যুগ আসেনি।

স্টিমার ঘাটে পৌঁছনোর পর স্টিমার থেকে মোটা কাছি ছুড়ে দেওয়া হয়। সেগুলো ঘাটের পাশে শক্ত করে পোঁতা মোটা গজারি গাছের খুঁটিতে বাঁধা হয়। কাছি মানে শক্ত দড়ি, সেই দড়ির অন্য দুই প্রান্ত এবার আবার ছুড়ে দেওয়া হয় স্টিমারে, সেখানে সারেঙরা প্রবেশ পথের দু-পাশে দড়ি বেঁধে রেলিং বানায়। এরপর পাটাতন নামিয়ে দেয় স্টিমার থেকে, বড় বড় চওড়া কাঠের তক্তা, সেগুলো হল নামা-ওঠার সিঁড়ি।

সিঁড়ি নামানোর সময় যারা সেই সিঁড়ি দিয়ে নামবে, যারা উঠবে দুই পক্ষই উত্তাল, অস্থির হয়ে পড়ে। কে আগে নামবে, কে আগে উঠবে।

আমাদের অবশ্য অস্থিরতার প্রয়োজন ছিল না। পুরনো ওকালতি সেরেস্তা আমাদের, বাবা-ঠাকুর্দা সবাই উকিল। স্টিমার কোম্পানির কী একটা মামলা ছিল সরকারের ঘরে। তার এক পক্ষে বাবা, অন্য পক্ষে ঠাকুর্দা।

সুতরাং এই জাহাজে আমাদের উঠতে কোনও বাধা নেই। আমাদের কোনও টিকিট লাগে না। জাহাজে মানে স্টিমারে যতই ভিড় হোক, আমাদের জায়গা আছে সারেঙের ঘরে, সেখানে শুধু চেয়ার-বেঞ্চ নয়, একটা বিছানা, একটা বাথরুম আছে।

কিন্তু সেদিন নদীর ঘাটে আমরা ছাড়াও ভি আই পি ছিল।

ওই স্টিমারেই কলকাতা থেকে আসছিল পুলিস সাহেবের কন্যাদ্বয়, লিটি-কিটি, তাদের স্কুলের ছুটি হয়েছে। আমাদের শহর থেকে দুজন সেপাই নিয়ে একজন দারোগা সিরাজগঞ্জ ঘাটে গিয়েছিল কলকাতার ট্রেন থেকে লিটি-কিটিকে নিয়ে আসতে।

স্টিমার ঘাটে লাগতে সিঁড়ি জুড়বার পর অন্য সব যাত্রীর ওঠা-নামা স্থগিত রেখে সর্বপ্রথমে লিটি-কিটিকে পুলিস আলাদা করে ঘাটে নামাল। একটু শোরগোল, একটু

গুঞ্জন উঠেছিল। কিন্তু চিরকালই পুলিস এরকম করে থাকে। সবাই ব্যাপারটা মেনে নিয়ে প্রবেশপথ খুলে দেওয়ামাত্র যে যার ওঠা-নামা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আমরা ভিড় থেকে একটু দূরে ঘাটের একপাশে একটা গাবগাছের ছায়ায় অপেক্ষা করছিলাম। আমাদের তাড়াতাড়ি করার কোনও দরকার নেই। আমাদের সঙ্গে আমাদের সেরেস্তার মুহুরিবাবু পরেশ চক্রবর্তী এসেছেন, ধাক্কাধাক্কি থামলে পরেশবাবু আমাদের সারেঙের ঘরে গিয়ে বসিয়ে দিয়ে আসবেন।

সৌভাগ্যক্রমে পুলিসের লোকেরা লিটি-কিটিকেও আমাদের পাশে ওই গাবতলায় নিয়ে এল। পরেশবাবুর সঙ্গে তাঁদের মুখচেনা আছে। দারোগাবাবু লিটি-কিটিকে আমাদের পাশে দাঁড় করিয়ে পরেশবাবুর জিম্মায় রেখে সেপাই নিয়ে স্টিমারে ফিরে গেলেন লিটি কিটির জিনিসপত্র নিয়ে আসতে।

লিটি-কিটি আমাদের একেবারে পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। আশ্বিন মাসের দিন। নীল আকাশ, সাদা মেঘ। যমুনার জল ছলাৎ ছলাৎ করে ঘাটে এসে লাগছে। ঘন গাবপাতার মধ্যে ঝিরিঝিরি শারদীয় বাতাস। ঘাটের অদূরে বাঁশবনের মধ্যে দুটো ইষ্টিকুটুম পাখি থেমে থেমে ডাকছে।

আমি আর দাদা বিহ্বল হয়ে লিটি-কিটির দিকে তাকিয়ে আছি। দাদা একটু বেশি অভিভূত। যদিও পূর্ণ মেম নয়, এত সামনে থেকে সেই আমাদের প্রথম মেমদর্শন।

মেয়ে দুটি হুবহু একরকম দেখতে। একটু রকমফের আছে কিন্তু প্রথম দর্শনে সেটা বোঝা যায় না।

আমাদের তখনকার চেনাশোনা মেয়েদের তুলনায় ওরা দুজনেই যথেষ্ট সপ্রতিভ, রীতিমতো স্মার্ট। ওদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে মিষ্টি হেসে বলল, 'হ্যালো। আই অ্যাম মেরিয়্যান।' একইরকম মিষ্টি হেসে দ্বিতীয়জন বলল, 'আর আমি মেরিয়েন।' পরিষ্কার বাংলা, আমাদের গ্রাম্য উচ্চারণের তুলনায় অনেক বেশি নিখুঁত।

এবার আমাদের বোধহয় নিজেদের নাম বলা উচিত ছিল। কিন্তু তার আগেই দারোগা বাবু সামনেই "ঘাটের পাশে রাস্তায় অপেক্ষমাণ একটা পাল্কি ঘোড়ার গাড়িতে ওদের দুজনকে তুলে দিলেন। সঙ্গের একজন সেপাই গাড়ির ছাদে উঠে কোচম্যানের পাশে বসল। একটা সাইকেল নদীর ঘাটের কোনও দোকানে দারোগাবাবু রেখে গিয়েছিলেন, তিনি সেই সাইকেলে ঘোড়ার গাড়ির পাশে পাশে চললেন। অন্য সেপাই হেঁটে আসতে লাগল।

আমরাও স্টিমারে গিয়ে উঠলাম। স্টিমারের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম, দু বোন গাড়ির জানালা দিয়ে হাত নাড়ছে, টা-টা।

একটু পরে স্টিমার ছাড়ল।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় ক্রমশ বিলীয়মান ঘোড়ার গাড়িটাকে যতক্ষণ দেখা যায় দাদা সারেঙের ঘরের গরাদহীন জানালার মধ্য দিয়ে মাথা গলিয়ে ততক্ষণ তাকিয়ে রইল।

দাদা যখন মাথা সরিয়ে ভেতরে নিয়ে এল, দাদার নাক-চোখ-মুখ, মাথার চুল সব জলে ভেজা, ফেনা মাখা। সারেঙের ঘরের জানলার নীচে স্টিমারের বড় চাকা, সেটার

ঘূর্ণনে পেঁজা তুলোর মত ছিটকিয়ে পড়ছে জলের ফেনা আর জল। জামার কলার পর্যন্ত ভিজে গেছে। দাদা জামাটা খুলে সেটা দিয়ে মুখ-মাথা মুছে সেটা কাঁধে নিয়ে দোতলার উপবে গিয়ে নদীব দিকে উদাস হয়ে তাকিয়ে রইল।

নদীতে কতরকম নৌকো ডিঙি, দুয়েকটা পানসি, বজরা। আকাশে চিল উড়ছে, দূরে তীরের দিকে বকের ঝাঁক। শরৎকালে আকাশ-বাতাস সবই সুমধুর, মনোরম।

আমি দাদার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। দাদা হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন মেয়েটির নাম মেরিয়েন আর কার নাম মেরিয়্যান, আবার দেখলে আলাদা করে চিনতে পারবি?'

আমিও এই কথাই ভাবছিলাম। চুপ করে রইলাম। তারপর বোকার মতো বললাম, 'গায়ের রঙ কী ফর্সা!'

দাদা বলল, 'মেমসাহেবদের গায়ের রঙ ফর্সা হবে না তো আমাদের মতো হবে নাকি?' তারপর বলল, 'দুজনেই একরকম দেখতে, যমজ নয় তো!'

পরে অবশ্য আমরা জেনেছিলাম, ওরা সত্যিই যমজ বোন। তবে একজন একটু মাথায় খাটো, আর তার ভুরুতে একটা ছোট কাটা দাগ। সে একটু হৃষ্টপুষ্টও বটে।

মেরিয়্যান, মেরিয়েন দুই যমজ বোনের ভালো নাম, সাহেবরা যাকে বলে 'গুড নেম'। মেয়ে দুটোর ডাকনাম হল লিটি আর কিটি। সেটা তখন জানিনি।

লিটি-কিটি কলকাতায় লরেটো স্কুলে সহপাঠিনী বাঙালি বান্ধবীদের সাহচর্যে বাংলা বলা কওয়া মোটামুটি পারে কিন্তু লিখতে পড়তে জানে না। পুলিসসাহেব সেই পুজোর ছুটিতে তাঁর মেয়েদের বাংলা শেখার বন্দোবস্ত করলেন। দেশ স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে, বাংলা না শিখলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। পুলিসসাহেবের সে হিসেবে অবশ্য মেলেনি। ইতিহাসের কোনও হিসেবই কোনওদিন মেলে না। তবু লোকে আশা করে।

তা, পুলিসসাহেব, সেই পুজোর ছুটিতে তাদের শহরের গার্লস স্কুলের গোপেশ মৈত্র, বাংলার টিচার, তাঁকে এক মাসের জন্য নিযুক্ত করলেন মেয়েদের বাংলা শেখার জন্যে। সেটা ভাগ্যক্রমে মৈত্রস্যার আমার আর দাদার গৃহশিক্ষক ছিলেন।

আমি আর দাদা দিদিমার মামাতো মহালয়ার পুজোয় গিয়েছিলাম। ঠিক ছিল মামার বাড়িতে কয়েকদিন থেকে ঠিক পুজোর মুখোমুখি পঞ্চমী বা ষষ্ঠীর দিন শহরে ফিরে আসব। এই প্রোগ্রাম দাদারই রচনা।

কিন্তু সেই জোড়া মেম-কিশোরী দাদার রুটিন বানচাল করে দিয়েছিল। এলাসিন পৌঁছে দাদা প্রথমেই ঘোষণা করে দিল, 'আমরা কালই ফিরব। মহালয়ার পুজো সাঙ্গ হওয়ার পর কালীমণ্ডপ থেকে সোজা স্টিমার ঘাটে চলে যাব। সেখানে প্রথম স্টিমার ধরব।'

দাদাকে কোনওভাবেই দিদিমা আটকাতে পারেননি। কোনওদিনই আটকানো যায়নি।

শহরে ফিরে আসায় একটা ক্ষতি অবশ্য হল। স্কুল ছুটি, কিন্তু মৈত্রস্যার ষষ্ঠীর আগে ছাড়বেন না।

আমরা ফিরে এসে প্রথম দিনই মৈত্রস্যারের পাল্লায় পড়লাম। সন্ধ্যাবেলা বাইরের বারান্দায় সতরঞ্চি ঢাকা তক্তাপোশের ওপরে বসে লণ্ঠনের আলোয় আমি পড়ছিলাম,

'ভালোবাসি নীলিমায়
চাঁদিনির রেখাটি',

এবং পাশেই দাদা পড়ছিল,

'কেন পান্থ ক্ষান্ত হও
হেরি দীর্ঘপথ।...'

এমন সময় মৈত্রস্যার বললেন, 'কাল থেকে বিকেলের দিকে আসব, সন্ধ্যাবেলা পুলিসসাহেবের বাংলোয় তাঁর মেয়েদের পড়াতে যেতে হবে।' মাস্টারমশায়ের গলায় বেশ একটু গর্বের ভাব, এরকম একটা গুরুদায়িত্ব তিনি পেয়েছেন।

দাদার যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। প্রশ্ন করল, 'আপনি ওদের পড়াবেন?'

দাদার 'দীর্ঘ্য' বানানে য ফলা কাটতে কাটতে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, পুরো পুজোর মাসটা পড়াতে হবে।'

পুলিসসাহেবের বাংলো আমাদের শহরের এক প্রান্তে। বাংলোর সামনে বড় মাঠ, সেখানে সময়মতো ফুটবল, ক্রিকেট খেলা হয়। মাঠের পাশে সিমেন্টে বাঁধানো টেনিস লন, সিমেন্টের হেলান দেওয়া বেঞ্চি।

মৈত্রস্যার সেদিন পড়িয়ে চলে যাওয়ার পরে দাদা আমাকে বলল, 'চল।' কোথায় যাচ্ছি কিছুই না জেনে দাদার সঙ্গে চললাম, তবে বুঝতে পারলাম মেরিয়েনরা দাদাকে টানছে।

ঠিক তাই। দাদা আমাকে হাত ধরে নিয়ে সেই সিমেন্টের বেঞ্চিতে বসল। একদিন আগেই মহালয়া গেছে, ঘুটঘুটে অন্ধকার। অনেক দূরে সদর রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটির কেরোসিনের বাতি জ্বলছে।

পুলিসসাহেবের বাংলোও প্রায়ান্ধকার। তবু মৃদু আলোয় কাচের শার্সির মধ্য দিয়ে দেখা গেল একটা চোঙা গ্রামোফোনে রেকর্ড বসিয়ে দুই বোন হাত ধরাধরি করে নাচছে।

বেশ কয়েকটা গান হল। দুটো গান এখনও একটু মনে পড়ে, 'থ্রি কয়েনস ইন দ্য ফাউন্টেন', ঝর্নায় তিনটি পয়সা।

দাদার দখলে তখন একটা হারমোনিয়ম ছিল। সে হারমোনিয়ম বাজিয়ে যা-ইচ্ছে সুরে, ইচ্ছেমতো গান গায়। দাদা এবার ইংরেজি গান গাওয়া শুরু করল। বলাবাহুল্য, সে এক ভয়াবহ ব্যাপার। দৈনিক সকালে এক বোষ্টমী আসত গান শুনিয়ে ভিক্ষে করতে। দাদা একদিন তাকে ইংরেজি গান গেয়ে শোনাল। সেই বোষ্টমী কী বুঝল কে জানে, তারপর আর আমাদের বাড়িতে কখনও গান গাইতে আসেনি।

সে যা হোক, স্যারের কাছে আমরা বিকেলবেলা পড়ার সময় মেমবালিকাদের বিষয়ে খুঁটিনাটি খবর পেতে লাগলাম। এ ব্যাপারে দাদার উৎসাহ এবং কৌতূহল ছিল অপরিসীম।

মৈত্রস্যারই বললেন, মেয়ে দুটো আর তাদের মা-বাবা, সবাই কলকাতার পুরনো বংশের, সবাই ভালো বাংলা বলে, বোঝে। তবে লিখতে-পড়তে খুব একটা পারে না।

তিনিই বললেন যে ছোটবেলায় নীল চোখ, লালচে চুল দুই শিশুকে ওদের ঠাকুমা আদর করে বলতেন, 'একেবারে একজোড়া বিড়াল ছানা।' সেই ফিরিঙ্গিবুড়ি দুই নাতনির একত্রে নাম রেখেছিলেন, 'লিটল কিটেন।' যে মেয়েটি একটু ছোটখাট সে হল লিটল বা লিটি এবং অন্যটি হল কিটেন বা কিটি।

মৈত্রস্যারই লিটি-কিটির সঙ্গে আমাদের মেলামেশার সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

আমাদের শহরে বড় দুর্গোৎসব হত, কালীবাড়িতে বারোয়ারি পুজো। খুব ভিড়, হৈ-হৈ, জমজমাট প্রায় মেলার মতো।

অষ্টমীর দিন বিকেলে মৈত্রস্যার এসে আমাদের বললেন, 'লিটি-কিটি খুব পুজো দেখতে চাইছে, কলকাতায় দেখে তো। আমাদের গ্রামের বাড়িতে মহানবমীতে ঘটপুজো হয়, আমি আজই সেখানে চলে যাচ্ছি। তোমরা কি কাল লিটি-কিটিকে ঠাকুর দেখাতে পারবে?'

দাদা এক বাক্যে রাজি, আমি তো সঙ্গেই আছি। ঠিক হল, সন্ধ্যাবেলা নয়, অত ভিড়-ভাটকায় ওদের নিয়ে যাওয়া সুবিধে হবে না, ওদের দুজনকে দাদা আর আমি গিয়ে বাংলো থেকে কালীবাড়িতে নিয়ে আসব সকালবেলা।

সকাল আটটা নাগাদ ওদের বাংলোয় গিয়ে দেখি ওরা সেজে-গুজে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। লম্বা ঝুল গোলাপি ফ্রকের ওপরে দুজনে গায়ের সঙ্গে লেপটে দুটো শিফনের শাড়ি পরেছে। একজনের শাড়ির রঙ আগুনে লাল, অন্যজনের গায়ে বেগুনি।

আমরা লিটি-কিটির সম্মুখীন হয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম, মুগ্ধাতিমুগ্ধ। একি স্বপ্ন, না মায়া! যেন লক্ষ্মীর পট থেকে দুই সুরকন্যা জীবন্ত বেরিয়ে এসেছে।

এই দুই ডানাকাটা পরীকে নিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া সহজ হত না। পুলিসসাহেব আগেই ব্যবস্থা করেছিলেন। দুটো ঘোড়ার গাড়িতে একটায় লিটি-কিটি, অন্যটায় আমরা দুজন উঠলাম। সঙ্গে সাইকেলে আরও দুজন কনস্টেবল।

ঠাকুর দেখে ওরা দুজনে খুব খুশি। সকালবেলা এমন নিরিবিলিতে প্রতিমা দেখবে ওরা আশা করেনি। কিন্তু বেশিক্ষণ নিরিবিলি রইল না। ওদের ঘিরে বেশ ভিড় হয়ে গেল। সেপাই দুজন ভিড় সরিয়ে তাড়াতাড়ি ওদের গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেল।

ইতিমধ্যে দাদার মাথায় নানারকম বুদ্ধি খেলেছে। দাদা বাসায় গিয়ে ঠাকুমাকে বলল—'আমাদের বাড়িতে যে লক্ষ্মীপুজো হয়, সেই লক্ষ্মীপুজোয় লিটি-কিটিকে নেমন্তন্ন করবে।'

ঠাকুমাকে সে কথা বলায় ঠাকুমা প্রথমে জিজ্ঞাসা করলেন, 'লিটি-কিটি কী?' তখন তাঁকে সম্যক বোঝানো হল এবং বলা হল যে, মৈত্রস্যারকে জিজ্ঞাসা করলে আরও জানতে পারবে। মৈত্রস্যার ঠাকুমার দূরসম্পর্কের বোনপো।

তাঁর সম্পর্কে ঠাকুমার একটু দুর্বলতা আছে। ঠাকুমা রাজি হয়ে যান।

অবশ্য নেমন্তন্ন করাই দাদার মূল উদ্দেশ্য ছিল না। দাদা মনে মনে ঠিক করেছিল, লিটি-কিটিকে ধর্মান্তরিত করে হিন্দু করবে।

দাদার কথা শুনে আমি বললাম—'সে কিন্তু সোজা ব্যাপার নয়।' দাদা বলল—'খুব সোজা। লক্ষ্মীপুজোর চিঁড়ে-নারকেল প্রসাদের সঙ্গে একবিন্দু গোবর খাইয়ে দিলেই হবে। আর লক্ষ্মীপুজোর মন্ত্র বলে ওদের দিয়ে গায়ত্রী মন্ত্র পড়িয়ে নিলেই হবে।'

পৈতের সময় আমরা গায়ত্রী মন্ত্র শিখেছিলাম। সেটা হিন্দু ব্রাহ্মণের এক অতি গূঢ় ব্যাপার। এমনকি ব্রাহ্মণ মহিলাদেরও সেই মন্ত্রে অধিকার ছিল না।

৫০-৬০ বছর আগের কথা এ সব। তখনও দাঙ্গায় দেশ ভাগে সংস্কার-কুসংস্কার, ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য একাকার হয়ে যায়নি।

গায়ত্রী মন্ত্রের কথাটা কিন্তু বাবার কানে উঠল। ঠাকুমাকে দাদা বিশ্বাস করে বলেছিল। কিন্তু ঠাকুমাই বোধহয় বাবাকে বলেন।

বাবা দাদার ওপর খুব চটে গেলেন। ডেকে ধমকে দিলেন। বললেন—'গায়ত্রী মন্ত্র নিয়ে ছেলেখেলা করতে যেও না, আর পুলিসসাহেবের মেয়েদের যদি গোবর খেয়ে কলেরা হয়, তোমাকে জেলে যেতে হবে।'

ফলে শেষ পর্যন্ত গোবর বা গায়ত্রী মন্ত্র কোনও ব্যবস্থাই লিটি-কিটির জন্য করা হয়নি। তবে সেদিন সন্ধ্যাবেলা লক্ষ্মীপুজোর সময় পুলিসসাহেব নিজে মেয়েদের নিয়ে এসেছিলেন। আগেরদিন বাবা গিয়ে সকন্যা পুলিসসাহেবকে নেমন্তন্ন করে এসেছিলেন।

কী যে খুশি হয়েছিল লিটি-কিটি খই-এর মোয়া, মুড়ির মোয়া, চিঁড়ের মোয়া, নারকেল নাড়ু, তিলের তক্তি খেয়ে।

সেদিন আমাদের পুরনো দালানের ছাদে উঠে কোজাগরী পুর্ণিমার বিশাল চাঁদের নীচে আমরা কত গল্পই যে করেছিলাম।

লিটি একটু উজ্জ্বল। সে খুব মজা করে তাদের ইস্কুলের, কলকাতার পাড়ার অনেক গল্প করেছিল। কিটিও যোগ দিয়েছিল। আমরা আর কী বলব, আমরা অভিভূত হয়েছিলাম।

নীচে বাইরের বারান্দায় পুলিসসাহেব, বাবা এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে গল্প করছিলেন। তিনি একটু বাদে মেয়েদের তাগাদা পাঠালেন, বাড়ি যাওয়ার জন্য নেমে আসতে।

নামার সময় শেষ মুহূর্তে দাদা বলল—'পদ্মফুল তুলতে যাবে?'

লিটি বলল—'এখন?'

দাদা বলল—'এখন নয়, সাতসকালে যেতে হবে, আমি দেখে এসেছি বাগমারির বিলে হাজার হাজার পদ্ম ফুটেছে। সেখান থেকেই তো আজ লক্ষ্মীপুজোয় এক ধামা ফুল এনেছিলাম। পুজোর ঘরে দেখলে তো?'

লিটি-কিটি খুশি মনে রাজি হয়ে গেল। বলল—'দেখি, বাবাকে জিজ্ঞাসা করে।'

পুলিসসাহেব রাজি হয়ে গেলেন, তবে সঙ্গে আগের মতোই দুজন সেপাই দিলেন।

কয়েকদিন পর এক খুব ভোরবেলা পুলিসসাহেবের বাংলোর সামনে দাঁড়াতেই লিটি-কিটি বেরিয়ে এল। দুজনেরই পরনে একইরকম ফুল-ফুল প্রিন্টের খাটো ফ্রক, পায়ে রঙিন কেডস।

খুব দূর নয় বাগমারির বিল, তার ওপরে আমরা নদীর চড়া দিয়ে শর্টকাটে গেলাম। সেপাই দুজন অবশ্য পেছনেই সঙ্গে সঙ্গে ছিল।

লিটি-কিটি যা দেখে, তাতেই অবাক হয়। মাঠে কতরকমের পাখি, তার মধ্যে গোসাপ ঘুরছে, ছোট পাখি ধরে খাবে। আকাশে বকের ঝাঁক, মাঝে মাঝে চিল ছোঁ মারছে অল্প জলে।

দাদা জলের মধ্যে নেমে একটা একটা করে পদ্মফুল ছিঁড়ে আমাদের দিকে ছুড়ে দিতে লাগল।

অল্প কিছু পদ্মফুল তোলার পরই দুই বোন অর্ধেক অর্ধেক করে সেগুলোকে কোলে তুলে বাড়ির দিকে দৌড় দিল। যেন এটা একটা খেলা।

নীল ফুলছাপ খাটো ফ্রকের নিচে তাদের ধবধবে মসৃণ পা হাঁটুর অনেক ওপরে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। বাতাসে তাদের লালচে চুল উড়ছে। শরতের সকালের সূর্যের সোনালি আলোয় তাদের ছায়া—আমি আর দাদা সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। ওরা কিন্তু ফিরেও তাকাল না।

pathagar.net

সেপাইরাও কিছু বুঝতে পারেনি। এর পরে তারাও ছুট দিল, লিটি-কিটির উদ্দেশে।

দাদা ব্যাপারটা সহজভাবে নেয়নি। লিটি-কিটির এই ইয়ার্কি তার পছন্দ হয়নি। আমি কিন্তু বেশ মজা পেয়েছিলাম।

আমার কৈশোর স্বপ্নে এক সোনালি সকালে চিত্রিত পোশাক, লাল-চুল, দুই জন মেম-বালিকার ছবি লেগে আছে। সেই ছবি আজও ঘুরেফিরে দেখি।

দাদা বহুদিন নেই, সে শহর, সে বাড়িও নেই। কিন্তু লিটি-কিটির স্বপ্ন আজও ফিরে আসে।

এর মধ্যে আমাদের সঙ্গে লিটি-কিটির আর দেখা হয়নি। মৈত্রস্যার কালীপুজোর পর একদিন বললেন, 'লিটি-কিটিরা কাল চলে যাবে। বড় ভালো মেয়ে দুটি।'

মৈত্রস্যার চলে যাওয়ার পরে আমি দাদাকে বললাম, 'চল কাল সকালে যাওয়ার আগে একবার দেখা করে আসি।' দাদা উদাসীনভাবে বলল—'তুই যা, আমি যাব না।'

আমি একাই গিয়েছিলাম, কিন্তু দেখা হয়নি। ওরা স্টিমারে না গিয়ে অনেক সকালে একটা সরকারি লঞ্চে করে সিরাজগঞ্জ চলে গেছে।

সে বছর বড়দিনে লিটি-কিটির থেকে দাদার নামে একটা রঙিন খাম এসেছিল। দাদা সেটা না খুলে, না পড়ে ছিঁড়ে ফেলে দেয়।

দাদা তখন বাবার আলমারি থেকে চুরি করে গোগ্রাসে বঙ্কিমচন্দ্র পড়ছে। চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে দাদা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল—'বঙ্কিম বলেছেন, বাল্যপ্রণয়ে অভিসম্পাত আছে। শুধু শুধু শখ করে অভিসম্পাত কুড়োতে যাই কেন?'

পরের বছর দেশ ভাগ হয়ে গেল পার্টিশন, পাকিস্তান। পুলিসসাহেব অপশন দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে গেলেন।

কয়েক বছর পরে কলকাতায় লিটি-কিটির খোঁজ করেছিলাম। ঠিকানা জানতাম না। ওরা যে পাড়ায় থাকত সেই পাড়ায় গিয়েছিলাম। শুনলাম, কেউ নেই। সবাই অনেকদিন আগে অস্ট্রেলিয়া চলে গেছে।

জগৎ সংসারে লিটি-কিটি শুধু আমার স্বপ্নে রয়ে গেল। এখনও কোনও কোনও রাতের ঘুমের মধ্যে সোনালি সকালে দুটি মেম-বালিকা বাগমারির বিলের ধারে দৌড়য়।

pathagar.net

আমাদের ছোট নদী

সেই তখন **এক**

যে নদী মরুপথে হারাল ধারা।

শান্তিনিকেতন থেকে মলিনাবৌদি আরো অনেক গানের সঙ্গে এ গানটা শিখে এসেছিলেন। মলিনাবৌদি গান গাইতে ভালোবাসতেন, কেউ সামান্য অনুরোধ করলেই গাইতেন। তিনি আমাদের শহরের মেয়ে নন। তাঁর বাপের বাড়ি ছিল বহুদূরে বোলপুরে, বিয়ের পর বৌ হয়ে আমাদের এখানে এসেছিলেন।

উৎসব অনুষ্ঠানে মলিনাবৌদিকে বললেই গান গাইতেন। কয়েক বছর শহরের ছেলে-মেয়েরা দল বেঁধে তাঁর কাছে গান শিখেছিল। মলিনাবৌদির বর পরেশদা ছিলেন এলাকার তরুণ চিকিৎসক। দু'টাকা ভিজিট, সে টাকাও সব্বাই দিতে পারত না। তখন অবশ্য টাকার দাম ছিল। মিষ্টির দোকানে টাকায় ষোলোটা সন্দেশ পাওয়া যেত, যার একেকটার দাম এখন চার টাকা।

পরেশদা নানা কারণে ব্যতিক্রমী ডাক্তার ছিলেন। ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের এল-এম-এফ, অর্থাৎ সেকালের ডিপ্লোমা পাশ ডাক্তার। রোগা, ফর্সা, লম্বা। আস্তিন গোটানো সাদা ফুলশার্ট, মালকোঁচা দিয়ে কোমরে বেল্ট কষে ধুতি পরা, গলায় স্টেথসকোপ ঝুলিয়ে একটা পুরনো সাইকেলে রাত দিন চক্কর দিতেন, শহরের মধ্যে, শহরের আশেপাশে গ্রামে। বাজারের একটা ওষুধের দোকানে সকাল-সন্ধ্যা কয়েক মিনিট করে যেতেন। তাঁর নিজের কোনও চেম্বার ছিল না। রোগীরা তাঁর কাছে যেত না, খবর পেলে তিনি রোগীর কাছে পৌঁছাতেন। তার জন্যে ভিজিটের কোনও তারতম্য হত না।

আমাদের বাড়ির মতোই পরেশদাদের পরিবার ছিল আমাদের শহরের পুরনো বাসিন্দা। পরেশদার বাবা আমাদের বিশেক্ত ভানুধ্যায়ী তরণী জ্যাঠা ছিলেন রাজকর্মচারী, বেঙ্গল পুলিস। চাকরি জীবনে চিরটা কাল বাইরে-বাইরে থেকেছেন। বোলপুর থানায় তিনি বোধহয় একসময় দারোগা ছিলেন। তখন পরেশদা স্কুলে পড়ে। সেই সূত্রেই পরে শান্তিনিকেতনী মলিনাদির সঙ্গে পরেশদার কিছুটা জানাশোনা, কিছুটা সম্বন্ধক্রমে বিয়ে হয়েছিল।

চাকরি জীবনে তরণীজ্যাঠা কালে ভদ্রে বাড়ি থাকতে পারতেন, তবে গরমের ছুটিতে, পুজোর ছুটিতে পরেশদারা এসে থাকতেন। ওঁদের বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে দূরে ছিল না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পশ্চিম দিকে একটু এগোলে কালীবাড়ি, কালীবাড়ির পাশে খালধারের সড়ক। সেই সড়কে খালধারের একটু আগেই এক জোড়া বুড়ো লিচুগাছের নীচে টিনের বেড়া দেয়া, টিনের চালের ছোট-বড় কয়েকটা ঘর নিয়ে পরেশদাদের বাড়ি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি একটা বছরে, বোধ হয় সেটা সেই বড় দুর্ভিক্ষের বছর। বাংলা তেরশো পঞ্চাশ। তরণীজ্যাঠা চাকরি থেকে অবসর নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। সরকারি চাকরির প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা, তা ছাড়া পুলিশের অনেক রকম ডান হাত-বাঁ হাত আছে এবং ছিল। সব টাকা একত্র করে তরণীজ্যাঠা টিনের বাড়ি ভেঙে সুন্দর দোতলা বাড়ি

করলেন, তেতলার চিলেকোঠায় গৃহদেবতা সত্যনারায়ণের মন্দির, চূড়ায় স্বস্তিকা চিহ্ন। স্বস্তিকা চিহ্নের ওপরে সংস্কৃতে ওঁ লেখা, সংস্কৃত ও অক্ষরটা বাংলার ক আর ত সংযুক্ত বর্ণের মতো দেখতে। মানে এই রকম, ক্তঁ।

তখন কি কেউ ভেবেছিল স্বস্তিকা আর ওঁ-য়ের দিন শেষ হয়ে এসেছে। শুধু ধর্মের কারণে সাতপুরুষের ভিটেমাটি উচ্ছন্নে যাবে। সব কিছু ফেলে রেখে একদিন চলে আসতে হবে। পাকা-দারোগা তরণীজ্যাঠাও কিছুই টের পাননি। তাহলে কি আর সর্বস্ব ব্যয় করে দোতলা বাড়ি বানাতেন। মুসলিম লিগের বাংলা সরকারে তিনি বহু বছর দারোগাগিরি করেছিলেন। অনেক আদেশ তামিল করতে গিয়ে খটকা লাগত, একটা অমঙ্গলের ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছিল।

জীবনে যত পূজা

দুই

পুরনো ভিটেয় নতুন বাড়ি তৈরি করার উদ্দীপনা ও ব্যস্ততায় এসব খেয়াল ছিল না তরণীজ্যাঠার। তবে ভরদুপুরে কালীবাড়ির পিছনে বাঁশবনে একদল দাঁড়কাক ক্লান্ত, ব্যর্থ স্বরে ডেকে যেত দিনের পর দিন, তরণীজ্যাঠার ভালো লাগত না। তাছাড়া তিনতলার চূড়ায় ওঁ-য়ের চন্দ্রবিন্দুটা লাগানোর সময় কেমন বেঁকে গিয়েছিল, তরণীজ্যাঠা খুব মাথা ঘামাতেন। অথচ সেটা ঠিকঠাক করার কোনও চেষ্টা করেননি।

এই রকম সময়ে পরেশদা এল. এম. এফ. পাস করে চলে এলেন। দু'এক বছর আগে পাস হলে রক্ষা ছিল না। মেডিক্যাল স্কুল থেকে সরাসরি যুদ্ধে যেতে হত। কয়েক বছর যুদ্ধ করে বেঁচে থাকলে মেজর-টেজর হয়ে ফিরতেন।

আমার বাবা পরেশদাকে বলেছিলেন, 'যুদ্ধ তো প্রায় শেষ। তুমি যুদ্ধটা সেরে মেজর হয়ে ফিরে আসতে।' পরেশদা হেসে বলেছিলেন, 'জটুকাকা। আমার তো গত বছরেই একুশ বছর পূর্ণ হয়ে গেছে, 'আমি তো একা-একাই মেজর।'

বাড়ি হয়ে গেছে। যুদ্ধ শেষ। অপ্রিয়মাণ দুর্ভিক্ষ। ছেলে ডাক্তার হয়ে ফিরে এসেছে, যুদ্ধে যেতে হয়নি। দেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে, বিপত্নীক অবসরপ্রাপ্ত বুড়ো দারোগা ছেলের বিয়ের তোড়জোড় করলেন। বৈশাখ মাসে পরেশদাদের উঠোনের দুটো বুড়ো লিচুগাছ ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল। লিচুফুলের ক্ষীণ সৌরভে কালীবাড়ি থেকে খাল পর্যন্ত পুরো এলাকা আচ্ছন্ন। কয়েক জোড়া কোকিল যেন কোথা থেকে হঠাৎ এসেছিল, তারা ডাকা-ডাকি হাঁকাহাঁকি করে পুরো শহরটা তোলপাড় করে দিল।

পূর্বনির্বাচিত পাত্রীর সঙ্গে পরেশদার বিয়ে দিলেন তরণীদারোগা। জোড় বন্দি হয়ে সুদূর রাঢ়ভূমির কন্যা মলিনাবৌদি আমাদের শহরে এলেন।

বৌভাতের পরের রবিবার সন্ধ্যাবেলা বাবা আমাদের বাড়িতে নববধূসহ পরেশদাকে নিমন্ত্রণ করে এলেন। শহরের অনেক গণ্যমান্য লোক, পাড়া-প্রতিবেশীকেও বললেন। ঠিক নৈশভোজ না হলেও আয়োজন প্রচুর। বড় বড় লুচি, বোঁটাসুদ্ধ ফালি করে বেগুন ভাজা, আলুর দম, মাছের কালিয়া, আমচুরের ঘন চাটনি, পোড়াবাড়ির চমচম, মুক্তাগাছার মণ্ডা।

সেই আসরেই বাবা বললেন, 'আমাদের নতুন বৌমা খুব ভাল গাইতে পারেন, রবিঠাকুরের ভালো ভালো গান।'

বিশেষ অনুরোধ করতে হল না। পরেশদা আর মলিনাবৌদি গোল বারান্দার এক পাশে বসেছিলেন। দাদা সেখান থেকে হাত ধরে মলিনাবৌদিকে এনে আসরের মাঝখানে বসিয়ে দিল। পরেশদাও উঠে আসছিলেন, ব্রাহ্ম সমাজের বুড়ো নিশিকান্তবাবু হেসে বললেন, 'তুমি ওখানেই থাকো।' তারপর মলিনাবৌদিকে কোলের কাছে বসিয়ে বললেন, 'প্রাণ খুলে গাও মা। কতকাল ভালো গান শুনিনি।' মলিনাবৌদির কোনও সঙ্কোচ ছিল না, তাঁর বয়েস তখন আঠারো, একালের তুলনায় কিছুই না। এর মধ্যে দাদা দুয়েকজন সঙ্গীসাথীকে নিয়ে দৌড়ে গিয়ে পরেশদাদের বাড়ি থেকে একটা কাঠের বাক্স ধরাধরি করে নিয়ে এসেছে। বাক্সটার ভেতরে একটা মাঝারি আকারের ডোয়ার্কিনের হারমনিয়াম। মলিনাবৌদির বিয়ের দানসামগ্রীর সঙ্গে এটাও এসেছে। যদিও তখনও শান্তিনিকেতনে হারমনিয়াম প্রায় অচল ছিল, এটা উপহার দিয়েছিলেন মলিনাবৌদির কলকাতাবাসী গাইয়ে মামা।

হারমনিয়াম এসে গেল। ততক্ষণে মলিনাবৌদি খালি গলাতেই গান ধরেছেন, 'জীবনে যত পূজা...।'

গান থামল। বৃদ্ধ নিশিকান্ত চোখ বুজে গান শুনছিলেন। তাঁর বোজা চোখ দিয়ে তখন ঝরঝর করে জল পড়ছে। কুলুঙ্গিতে ছোট হ্যাজাক কেমন স্তিমিত হয়ে এসেছে। বাইরে একটানা ঝিঁঝিঁ ডাকছে। উঠোনে জোনাকি। মিউনিসিপ্যালিটির বড় রাস্তার ওপার থেকে হেমন্তের বাতাসে পাকা ফসলের মৃদু সৌরভ ভেসে আসছে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠল সুপুরি বনের ফাঁকে।

দাদা

তিন

আমার দাদাকে আপনারা কেউ চিনবেন কি? দাদা মারা গেছে সে'ও প্রায় তিরিশ বছর হতে চলল।

তবুও কেউ কেউ হয়তো মনে করতে পারবেন। আমাদের সেই পুরনো শহরের সে আমলের কেউ। কিংবা ইংরেজি পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে ষাটের দশকের শেষ পর্যন্ত, দাদা যখন দেশ ছেড়ে এসে আমার সঙ্গে আমাদের পুরনো কালীঘাটের বাড়িতে থাকত। আসলে দাদার মানসিক ভারসাম্য ছিল না। সেই আমলের পাকিস্তান উলটো-পালটা চিন্তা বা কাজ হিন্দু যুবকের পক্ষে নিরাপদ ছিল না। আর কিছু না হোক, হিন্দুস্তানের স্পাই বলেও নির্যাতিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

দাদার কথা ইতস্তত এদিক-ওদিক অনেক লিখেছি। পাঠকেরা হয়তো মনে করতে পারবেন। দাদাব বিষয়ে একটা কথা আবার বলি।

দাদার আত্ম-পর জ্ঞান অতি প্রখর ছিল। অনেকে বলত পাকিস্তান হয়ে সব কিছু বেওয়ারিশ হয়ে যাওয়ার জন্যে এরকম মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। কিন্তু আমি জানি ঠিক তা নয়। কারণ তখন এরকম চিন্তার বয়েস হয়নি।

দাদা দেশ থেকে কালীঘাটে চলে আসার সময় কিছু জামাকাপড়, দু-চারটে বই, এ সবের অতিরিক্ত একবাক্স চকখড়ি এনেছিল। আমাদের বাড়ির বাইরের উঠোনে একটা পুরনো বিশাল আটচালা ঘরে, যেটা আগে জমিদারি সেরেস্তা ছিল, সেখানে তখন একটা পাঠশালা বসত। দাদা ওই পাঠশালার আলমারি থেকে গোপনে এক বাক্স চকখড়ি

সরিয়ে নিয়ে আসে। সীমান্তে কাস্টমসের লোকেরা সব কিছুতেই ভাগ বসাত, তারা দাদার কাছে কিছু না পেয়ে আধবাক্স চকখড়ি নিয়ে নিয়েছিল। দাদা বহুদিন পর্যন্ত এই নিয়ে মাথা ঘামাত, 'চকখড়িগুলো ওদের কী কাজে লাগবে?'

সে যা হোক, কালীঘাট বাড়ি থেকে দৈনিক সকালবেলা চা-টা খেয়ে দাদা বেরোত একটা চকখড়ি হাতে নিয়ে। কঠোর পরিশ্রম করত বেলা একটা-দেড়টা পর্যন্ত।

দাদার ভালো নাম ছিল শেখর রায়। দাদা সই করত এস. রায়। প্রথম দিনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথমেই দাদা বাড়ির দরজায় চকখড়ি দিয়ে সই করল, 'এস. রায়।' আমাদের সদর দরজার ডাইনে সুপ্রাচীন 'রক ক্লাব'। একটু ইতস্তত করে দাদা সেখানেও সই করল। বাঁয়ে কালীঘাট মণ্ডল কংগ্রেসের অফিস। অনেক চিন্তা করে, অনেক দ্বিধার পরে দাদা সে অফিসের দেয়ালে লিখল 'এস. রায় নট', 'S. Ray. Not' ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষায়, অর্থাৎ দাদা তার এক্তিয়ার থেকে কংগ্রেস অফিসটাকে ছাড় দিল।

বলাবাহুল্য, 'এস. রায়' এবং 'এস. রায় নট' এই দু'রকম ভাগাভাগির সহজ অর্থ ছিল এটা এস. রায়ের, মানে শেখর রায়ের। এবং অন্যটা এস. রায় নট মানে শেখর রায়ের নয়।

দাদা এইভাবে দক্ষিণে রাসবিহারীর মোড় থেকে উত্তরে জগুবাবুর বাজার পর্যন্ত চিহ্নিত করে ফেলেছিল। এ ব্যাপারে দাদার কার্যকলাপ ছিল সুচিন্তিত। তবে সে চিন্তা তার ছিল নিজস্ব। সেটা অনুধাবন করার ক্ষমতা আমাদের কারও ছিল না।

দাদা হাজরা পার্ক এবং আশুতোষ কলেজকে ছাড় দিয়েছিল দেয়ালে এস. রায় নট লিখে। এর কারণ হয়ত অনুমান করা যায় কিন্তু দাদা কেন যে বসুশ্রী আর ভারতী সিনেমাকে এস. রায় করে মধ্যবর্তী বিজলি সিনেমাকে এস. রায় নট করেছিল, সে কখনও জানা যায়নি।

তবে বিজলি সিনেমার পাশে লাল বাড়ি, পুলিশ সেকশন হাউস, ভবানীপুর থানাকে দাদা এস. রায় খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

কিন্তু পরে একটা খারাপ ব্যাপার ঘটেছিল। আরও বহুজনের মতো দাদাও একবার ভবানীপুর থানার দেয়ালে মূত্রত্যাগ করেছিল। মূত্র গন্ধে জর্জরিত থানার সেপাইরা মাঝেমধ্যে দুয়েক জনকে ধরে নিয়ে যেত। একবার দাদা ধরা পড়েছিল। হাতের আংটি জামিন রেখে দাদা সেদিন খালাস পায়। পরদিন সকালে দশটাকা জরিমানা কিংবা ঘুষ দিয়ে আমি দাদার সঙ্গে গিয়ে থানা থেকে সে আংটি ছাড়িয়ে আনি।

দাদা কিন্তু এর পরেও অদম্য, সামনের দিকে ক্রমশ এগোচ্ছে। সমান্তরালভাবে উলটো দিকেও কাজ চলছে। হাজরা মোড় থেকে এগিয়ে কুণ্ডুদের ডাক্তারখানা, দাদা সেটাকে এস. রায় চিহ্নিত করল। কিন্তু চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, শিশু সদন সব নট। তবে গলির মধ্যে একটু এগিয়ে বেলতলায় এস. এস. রায় নেমপ্লেটে একটা এস কেটে দিয়ে দাদা লিখল 'ইয়েস'।

এত সব বিস্তারিত বলা যাবে না, তবে দাদার এই আত্মপর বিবেচনা, সম্মুখ সংসারকে এস রায় এবং এস রায় নটে চিহ্নিত করা এসব কলকাতায় এসে শুরু হয়নি।

চার

দাদার এই বাতিকের শুরু বেশ কয়েক বছর আগে। আমাদের ফিরে যেতে হচ্ছে আমাদের বাসাব সেই সান্ধ্য আসরে যেখানে নববধু মলিনাবৌদি প্রথম গান গেয়েছিলেন।

হেমন্তের হিম-হিম সন্ধ্যা। বাতাসে দূরাগত পাকা ধানের ক্ষীণ সৌরভ। ঝিঁঝিঁ ডাকছে, উঠোনে জোনাকি। কুলুঙ্গিতে স্তিমিত হ্যাজাক। নিশিকান্তবাবুর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে, 'আমার অনাগত আমার অনাহত', মলিনাবৌদির গান সদ্য শেষ হয়েছে।

দাদা এমন সময় ঠেলেঠুলে হারমনিয়ামের বাক্সটা নিয়ে কষ্ট করে জায়গা করে নিয়ে বাক্স খুলে হারমনিয়াম বার করে মলিনাবৌদির সামনে বসিয়ে দিল, উলটো দিকে নিজে বসল।

বিনা বাক্যব্যয়ে মলিনাবৌদি গান ধরলেন, একটার পর একটা গান। রবি ঠাকুরের গান। শেষ গানটা ছিল অতুলপ্রসাদের, 'গানের তরী ভাসিয়ে দিলেম নয়নজলে।'

সবাই মোহিত হয়ে গেল। সকলেই চুপ, শুধু বৃদ্ধ নিশিকান্ত বললেন, 'যে নদী মরুপথে' গানটা আরেকবার গাও মা।' সেই ছোট শহরে মলিনাবৌদি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন।

গোলমেলে ঘটনা ঘটল পরদিন সকালে। প্রায় সাতসকালে তরণী দারোগা বাবার কাছে নালিশ করতে এলেন, বাবাকে বললেন, 'কাল শেখর বৌমার নতুন হারমনিয়ামের খুব ক্ষতি করে দিয়েছে।'

বাবার সঙ্গে আমরা কেউ কেউ, দাদা বাদে, ক্ষতিটা কী দেখতে পরেশদাদের বাড়িতে গেলাম। দেখলাম হারমনিয়ামের উলটো দিকের কাঠে বার্নিশ চিরে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা 'এস. রায়,' 'S. Ray' ইংরেজি ও বাংলায় দাদার স্বাক্ষর। দাদার কাছে বোধহয় একটা পেরেক বা মোটা আলপিন ছিল। তাই দিয়ে বার্নিশ চিরে সই করা।

হারমনিয়ামটা উঠোনে নামানো ছিল। বাড়ির মধ্য থেকে কান্নার আওয়াজ আসছিল। মলিনাবৌদির সঙ্গে আট-দশ বছরের এক খুড়তুতো বোন নববধূর সঙ্গিনী হয়ে এসেছিল। দ্বিরাগমনের সময় বর-বৌয়ের সঙ্গে আবার ফিরে যাবে। সেকালে এমন চল ছিল।

ডুকরে কেঁদে ওঠার পর কিছুক্ষণ ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদা, তারপর আবার ডুকরে কেঁদে ওঠা, গানের অন্তরার পর সঞ্চারীর মতো। রোদনের বিস্তার রাঢ় বঙ্গের মহিলাদের খুব প্রিয়। ফ্রিল দেয়া লাল রঙের ফ্রকপরা মলিনাবৌদির ফর্সা টুকটুকে আমাদের সমবয়সিনী বোনটি কেঁদে যাচ্ছিল আর যথাসময়ে ডুকরে উঠছিল, 'ওগো, এ আমাদের কি সর্বনাশ হল গো।' অন্তরা এবং সঞ্চারীর ফাঁকে ফাঁকে মলিনাবৌদির হাপুস কান্নার শব্দও পাচ্ছিলাম। বোধ হয় একটু আগেই ক্ষতিটা নজরে এসেছে।

অবস্থা বুঝে বাবা কোনও কিছু না বলে তরণী দারোগার বাড়ি থেকে চলে এলেন, আমরাও ফিরলাম। আমরা ভেবেছিলাম দাদার আজ খুব উত্তম-মধ্যম হবে। কিন্তু বাবা দাদাকে আজ কিছু বললেন না।

আমাদের পুরুষানুক্রমে উকিল বংশ, বাবাও উকিল ছিলেন। আমাদের মহকুমার জমি-জিরেতওলা এক ভদ্রলোক কলকাতায় চাকরি করতেন। তিনি বাবার মক্কেল, মামলার কাজে বাবার কাছে এসেছিলেন। বাবা তাঁকে অনুরোধ করলেন একটা ডোয়ার্কিনের হারমনিয়াম কিনে কলকাতা থেকে পাঠিয়ে দিতে।

দশদিনের মাথায় একটা বিশাল আকারের হারমনিয়াম আমাদের বাসায় এসে পৌঁছল।

দাদা বলল, 'এ তো ডবল সাইজের। ছুতোর দিয়ে কেটে অর্ধেক করে মলিনাবৌদিকে দিলেই হবে।'

তা অবশ্য হল না। তবে বড় হারমনিয়ামটা মলিনাবৌদিকে পৌঁছে দিতে দাদা গিয়েছিল এবং ফিরে আসার সময় এস. রায় নামাঙ্কিত আগেরটা নিয়ে চলে এসেছিল।

সে এক ভয়াবহ ব্যাপার। সেই হারমনিয়াম বাজিয়ে দাদা তার বেসুরো গলায় গান গাইতে শুরু করল। বিচিত্র সঙ্গীত লহরী। দাদা তখন কৈশোরের সীমানায়। গলা ভেঙে পুরুষালি ভাব আসছে কণ্ঠে, গানের মধ্যে কোথাও কোনও সুরের ছোঁয়া নেই। সর্বোপরি অশিক্ষিত হাতে বেপরোয়া হারমনিয়াম বাজানো—বাড়ির লোক তো বটেই পাড়ার লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

অথচ দাদাকে এ বিষয়ে কিছু বলা যেত না। যাই বলা হোক দাদা বলত, 'দারোগা বাড়ির বউ যে সারাদিন রাত গান গায় আগে তাকে গান থামাতে বল।'

দাদা কিন্তু সকাল-সন্ধ্যা মলিনাবৌদি যখন গান সাধতেন কিংবা রেওয়াজ করতেন দারোগাবাড়ির চারপাশে খাতা-পেনসিল নিয়ে ঘুরঘুর করত। কোনও নতুন গান শুনলেই টুকে আনত। তারপরে প্রায় হেঁড়ে-হয়ে আসা আদুর গলায় হারমনিয়ামের উল্টোপাল্টা সঙ্গতে সে গান বিভীষিকা সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখত।

দাদার চালাকি ছিল অনেক রকম। পারতপক্ষে বাবা বাসায় থাকলে গান ধরত না। এ দিকে আমার ঠাকুমা শেষ বয়েসে বদ্ধ কালা হয়ে গিয়েছিলেন, তিনি হারমনিয়াম বাজিয়ে দাদার গান দু চোখ ভরে দেখতেন আর বলতেন 'কি চমৎকার! একেবারে নিধুবাবুর মতো গাইছে।'

দাদার গানের ব্যাপারে আরেকটু বলার আছে। আমাদের শহরের পুলিসসাহেব ছিলেন এক অ্যাংলোইন্ডিয়ান ভদ্রলোক। লিটি আর কিটি তাঁর দুই মেয়ে, প্রায় আমাদেরই বয়েসী, কলকাতায় পড়ত, গরমের ছুটিতে, বড়দিনের ছুটিতে বাবা-মার কাছে আসত। ছুটিতে এসে তাদের একমাত্র কাজ ছিল রাত দিন গ্রামোফোনে বিলিতি গান বাজানো।

শহরের আরও অনেক কিশোর ও নবযুবকের মতো দাদারও ইচ্ছে ছিল লিটি কিটির সঙ্গে আলাপ করা, ভাব করা কিন্তু ইংরেজিতে কথা বলতে হবে বলে সেটা সম্ভব হয়নি।

দাদা তাদের রেকর্ডে বাজানো ইংরেজি গান শুনে খুব উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু সেসব গানের কথা দাদা টুকে আনতে পারেনি। তবে দাদার অসুবিধে হয়নি। দাদা মলিনাবৌদির কয়েকটা গান ইংরেজি করেছিল। সেই গান গুলো গলা খুলে গাইত।

একটা বিশেষভাবে মনে আছে। 'সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি,' দাদা করেছিল, 'ও মাই ডিফারেন্ট কলার ডে'স।' আরেকটা করুণ গান ছিল, 'হাফ লাইট, হাফ শ্যাডো দি মুন উইল রাইস নাউ।'

কেলেঙ্কারি চরমে উঠেছিল পরের বছর বিজয়া দশমীর সন্ধ্যাবেলা। প্রতিমার ভাসান হত আমাদের শহরের ছোট নদীর ঘাটে। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে সিদ্ধি খেয়ে ভাসানের একটা নৌকায় দাদা হারমনিয়াম নিয়ে উঠেছিল। ছোট ডিঙি নৌকো বেশি লাফালাফি হতে উলটে যায়। সকলের সঙ্গে দাদাও সাঁতরিয়ে পারে ওঠে, তবে হারমনিয়ামটা নদীতে তলিয়ে যায়।

বর্ষার শেষে নদীতে তখন টইটম্বুর জল। এ সময় জলে ডুব দিয়ে হারমনিয়াম

উদ্ধার করা যাবে না। শীতকালে জল কমার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

ভাসানের ঘাটে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা, কখনও কখনও অনেক রাত পর্যন্ত দাদা চলে ডোবা হারমনিয়ামটা পাহারা দিত। অবশেষে মাঘ মাসে নদীর জল নেমে যেতে দাদা নিজেই জলে ডুব দিয়ে জিনিসটাকে উদ্ধার করল। বেশ কষ্ট করতে হয়েছিল, স্রোতের টানে হারমনিয়ামটা দশ-বারো হাত এগিয়ে গিয়েছিল।

কাদামাখা হারমনিয়াম উদ্ধার করে ভাল করে ধুয়ে মুছে দেখা গেল দেখতে প্রায় এক রকমই আছে, বার্নিশটা একটু জ্বলে গেলেও দাদার সেই এস. রায় সইটা পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে। তবে যন্ত্রটা আর বাজেনি। সাদা-কালো রিডগুলো শক্ত হয়ে আটকে গিয়েছিল।

দাদার-ও গানের শখ চলে গিয়েছিল। ওদিকে অতিরিক্ত গান বিশেষ করে জিব বেঁকিয়ে ইংরেজি গান গেয়ে দাদার জিবে প্রচণ্ড ব্যথা। পরেশদা দেখে বললেন, 'এ রোগের কোনও চিকিৎসা নেই। বাংলা-ইংরেজি সব গান বন্ধ করতে হবে।'

দাদা পরে বলল, 'এ সব ওই মলিনার ষড়যন্ত্র।' কিন্তু গান গাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিল।

আমাদের ছোট নদী

পাঁচ

একটু আগে যে নদীর জলে নৌকো উলটে দাদার শখের হারমনিয়াম ডুবে যাওয়ার কথা বললাম, এবার সেই নদীর কাছে যাই।

নতুন যুগের গায়ক তাঁর এক মর্মস্পর্শী গানে কম্প্র কণ্ঠে অনুরোধ করেছেন, 'রঙ্গবন্ধু, হালকা হাসির কথা বল।'

হালকা হাসির কথাই তো বলি, হালকা হাসির কথাই তো বলতে চাই। কিন্তু দুএকটা কথা বাদ থেকে যাচ্ছে, সে কথাগুলো না বললে গল্পটা তো সম্পূর্ণ হবে না।

আমাদের একটা ছোট নদী ছিল।

আমাদের একটা ছোট শহর ছিল।

আমাদের একটা জন্মভূমি ছিল। ওই যাকে বলে সাতপুরুষের ভিটে।

কিছুই রইল না। দেশভাগ হয়ে গেল। আমাদের ভিটেটা পাকিস্তানে। চারদিকে পালাই-পালাই রব। কে কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে, কোন্ আঘাটায় কোনও কিছু ঠিক নেই। লোকেরা বাক্স-বিছানা মাথায় নিয়ে পুবের উদ্দেশে রওনা হল। পুরনো মানুষজন বিদায় নিয়ে সেখানে সব নতুন মুখ। আমরা তাদের বুঝতে পারি না।

আগে ছেলেরা মেয়েরা দল বেঁধে নদীর ধারে বড় পার্কে বেড়াতে যেতাম। কোথায় যেন বিধিনিষেধের বেড়া উঠেছে। নদীর জলও শুকিয়ে এসেছে, আগে নৌকোয়, লঞ্চে ছোট নদী ভরে থাকত, বর্ষার কয়েক মাস স্টিমারও আসত। ধীরে ধীরে সব বন্ধ হল।

এদিকে গ্রামাঞ্চল থেকে, ঢাকা-বরিশাল থেকে ভয়াবহ সব খবর আসছে। আমাদের শহর থেকে দশ মাইল দূরে আমাদের গ্রামের বাড়িতে শিবঠাকুরের প্রাচীন মন্দিরের পাশে খড়ের গোলায় একদিন শেষ রাতে কারা আগুন ধরিয়ে দিল। শহরের বাড়িতে খবরটা এল কিন্তু খোঁজখবর নিতে কেউ গেল না। আমাদের পাড়ার বাহাদুরবাবু মেয়ের বিয়ের বাজার করতে গিয়ে এক সন্ধ্যায় ঢাকার রাস্তায় খুন হলেন। সেই মেয়ের, আমাদের

pathagar.net

একান্ত ভালবাসার বিমলাদির আর কখনও বিয়ে হয়নি।

এ তো শুধু একদিকের কথা। এ দিকে এপারেও, কলকাতায়, বিহারে একই রকম সব অসম্ভব ব্যাপার ঘটছে। হিংসার বদলে হিংসা, রক্তের বদলে রক্ত, খুনের বদলে খুন।

দুঃখের দিন বড় লম্বা মনে হয়। সেই জন্যে দুঃখের কথা কম করে বলাই ভালো। এবার অন্য কথায় যাই।

দেশভাগের তিন-চার বছরের মধ্যে আমাদের অতবড় বাসা প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। দেশভাগের আগেই সেই সাতচল্লিশ সালের গোড়াতেই ঠাকুমা মারা গেলেন।

উনিশ শো একান্ন সালে আমি ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতায় চলে এলাম, সঙ্গে দাদা। কালীঘাটের ভাঙা বাসাবাড়িতে আমাদের, অনেক দিনের পুরনো আস্তানা। মা-বাবা আমাদের সঙ্গে এসে ফিরে গেল। একমাত্র বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় ছাড়া আর কখনও বেশিদিন এপারে এসে থাকেননি। আমরাও কখনও কদাচিৎ গেছি। তবে বাংলাদেশ যুদ্ধের পরে বাবা-মা'র সঙ্গে দাদা ফিরে গিয়েছিল। ফিরে গিয়ে দাদার ভালো লাগেনি। সে শহর নেই, সেই লোকজন নেই। কিন্তু কলকাতায় আর ফিরে আসেনি।

বাংলাদেশ হওয়ার পাঁচ বছর পরে মা মারা গেলেন। সাত বছর পরে দাদা। অত বড় বাসায় বাবা একা। দুয়েকজন কাজের লোক। বাইরের কাছারি ঘরে দুবেলা মুহুরি-মক্কেল কিন্তু আমাদের বাড়ির ভেতরটা একদম ফাঁকা। একটা লতানে গোলাপের গাছ ছিল বারান্দার গোল সিঁড়ির এক পাশে। অযত্নে সেটা জঙ্গল হয়ে গেছে, উঠোন-সিঁড়ি ছেয়ে বারান্দার থাম ধরে ছাদ পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। গিয়ে দেখেছি বারান্দার একপাশে পুরনো ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে বাবা কী যেন ভাবেন। গোলাপের লতার আড়ালে এক জোড়া শালিক বাসা করেছে। তারা মাঝেমাঝে ইজিচেয়ারের কাছে এসে বাবাকে দেখে যায়।

বাবার সঙ্গে কথা বলার, তর্ক করার কেউ নেই। বছর দশেক আগে পর্যন্ত নিশিকান্তবাবু বেঁচে ছিলেন। তরণীদারোগা মারা যান পার্টিশনের দুয়েক বছরের মধ্যেই।

উনিশ শো বাহান্ন সালে দুই দেশের মধ্যে পাশপোর্ট চালু হল। দেশ ছাড়ার আরেকটা হিড়িক পড়ল। সেই হিড়িকে পরেশদা এবং মলিনাবৌদি সদর দরজায় তালা দিয়ে একদিন প্রায় একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করলেন। ব্যাপারটা গোপনীয় ছিল, লুকিয়েই চলে আসতে হল। তার আগে গোপনে বাড়ি বেচা হয়ে গিয়েছিল।

তখন পরেশদার রমরমা পশার। ভালো উকিল, মাস্টার, ডাক্তার প্রায় সবাই দেশত্যাগী। পুরো শহরে আর শহরতলিতে পরেশদা একাই ডাক্তার। নাওয়া-খাওয়ার অবকাশ নেই।

মলিনাবৌদি ইতিমধ্যে বিখ্যাত গায়িকা হয়ে গেছেন। দূর-দূর থেকে ফাংশনে ডাক আসে। সে সব জায়গায় মলিনাবৌদি অনেক সময় রাত কাটায়। খ্যাতির পাশাপাশি কুৎসা আসে। হয়তো এ সব কারণেই পরেশদা শহর ছেড়েছিলেন। অবশ্য তাতে তাঁর কোনও ক্ষতি হয়নি। তিনি বেঁচে আছেন। শিলিগুড়িতে বিশাল পশার। মলিনাবৌদি বোধ হয় নেই। তার কথা কারও কাছে শুনি না।

বাবা মারা গেছেন কয়েক বছর আগে। সে সময়ে একবার গিয়েছিলাম। তারপর আর যাওয়া হয়নি। যাবই বা কোথায়, আমাদের সেইসব দালান-কোঠা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

এর মধ্যে একটা চিঠি এল বাংলাদেশ থেকে, মুক্তোর মতো অক্ষরে ঠিকানা লেখা। ভিতরের চিঠিতে লেখা।

"মাননীয় তারাদা,

অনেকদিন আপনার খবর জানি না। কাকাবাবুর মৃত্যুর পর আর আসিলেন না। আমাদের খবর এই যে আমার বর হায়দার আরব দেশের চাকরি পাইয়া বাংলাদেশের চাকরি ছাড়িয়া দিতেছে। আমরা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ওখানে চলিয়া যাইব। কাকাবাবুর কয়েকটা জিনিস আমার কাছে আছে। যাইবার আগে আপনার হাতে তুলিয়া দিতে পারিলে মনে শান্তি পাইব।

আদাব জানিবেন।

ইতি সেলিনা।"

সেলিনা? সেলিনাকে চিনতে অসুবিধে হল না। বাবার মৃত্যুর সময় পরিচয় হয়েছিল। সেলিনার বর হায়দারকেও মনে আছে। বাংলাদেশ প্রশাসনের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সেলিনা উকিল, বাবার চেম্বারে জুনিয়ার ছিল। অন্যান্য জুনিয়ারদের মতো সেও বাবাকে কাকাবাবু বলত।

কয়েকদিন ফাঁকা ছিলাম। ভিসা করে একদিন ঢাকা বিমানবন্দরে নেমে একটা গাড়ি ভাড়া করে আমাদের পুরনো শহরে পৌঁছে গেলাম। সেলিনাদের খবর দেওয়া ছিল। ছুটির দিনের সকাল। শহরের উত্তর দিকে নতুন জেলা শহরের পত্তন হয়েছে। জজ আদালতেরই পিছনে সারিসারি সরকারি কোয়ার্টার। একটা চারতলা বাড়ির একতলায় সেলিনাদের ফ্ল্যাটে পৌঁছে গেলাম।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। দু'জনেরই বয়েস চল্লিশের কোঠায়। একটু এদিক-ওদিক। একটি মাত্র মেয়ে। সে ঢাকায় পড়ছে।

দুপুরে সুন্দর খেলাম। ধলেশ্বরীর ইলিশ কাঁজলি মাছ। শহরের এ দিকটায় আগে কখনও আসিনি। খেয়ে উঠে খাওয়ার ঘরের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দেখছিলাম। শহরের এই নতুন দিকটা আমার অচেনা। দেখতে দেখতে সেলিনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখান থেকে নদীটা কতদূর?'

সেলিনা বলল, 'নদী তো নেই।' সেলিনার কথা শুনে অবাক হলাম, 'সে কী?' শুনলাম নদী মজে গিয়েছিল, সেই নদী ভরাট করেই শহরের এই নতুন অঞ্চল তৈরি হয়েছে।

দূরে তাকালাম। এদিক ওদিক কাশবন রয়েছে। কিন্তু নদীটা নেই। মনটা খারাপ হয়ে গেল। কত দিনের কত স্মৃতি। কত নৌকো কত মেলা। ভাসানের মেলায় নৌকো উলটে দাদার হারমনিয়াম ডুবে যাওয়া। একবার একটা কুমির এসেছিল, সারা শহরে কি হইচই, আরেকবার একটা সাপে কাটা মড়া ভাসতে ভাসতে এসেছিল।

সময় হয়ে এল। এবার উঠতে হবে। ঢাকায় ফিরে গিয়ে সন্ধ্যাবেলার ফ্লাইট ধরতে হবে। সেলিনা তিনটে জিনিস নিয়ে এল। ওরা বাবার কাছ থেকে পেয়েছিল। সেলিনাকে একটা পুরনো অক্সফোর্ড অভিধান, হায়দারকে সেকালের পার্কার কলম। আর, সেলিনার মেয়ে গান গায়, হারমনিয়ামটা তার। হঠাৎ দেখি সে এখন একটু অস্পষ্ট, তবু পড়া যাচ্ছে হারমনিয়ামের গায়ে দাদার সই এস. রায় রিং টিপে দেখলাম। বাজছে, মনে সারানো হয়েছে।

বাবার দেওয়া জিনিস আমি নেব কেন বললাম, 'সবই তোমাদের কাছে গচ্ছিত রইল। আমাদের ছোটবেলার ছোট নদীটাও তোমাদের কাছে জমা রেখে গেলাম।'

ফেরার পথে সেই সন্ধ্যার কথা বারবার মনে পড়তে লাগল। কুলুঙ্গিতে হ্যাজাক জ্বলছে। ঝিঁঝি ডাকছে। উঠোনে জোনাকি মলিনাবৌদি গাইছেন, 'যে নদী মরুপথে।' বুড়ো নিশিকান্তবাবুর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে।

---

pathagar.net